৪

মোশাররফ হোসেন খান

৪

মোশাররফ হোসেন খান

গল্পসূচি

দারুণ দুঃসাহসী এক অবাক পুরুষ। নাম উকাশা ইবন মিহসান (রা)। সবাই তাকে ডাকে আবু মিহসান নামে।

এই নামেই তিনি প্রসিদ্ধ।

এই নামেই তিনি পরিচিত।

রাসূলও (সা) তাকে আদর করে কাছে ডাকেন আবু মিহসান বলে।

রাসূলের (সা) ডাক !

সে ডাকে মধু ঝরে।

সে ডাকে শিশির ঝরে।

আর কুলকুল করে বয়ে যায় আবু মিহসানের বুকের ভেতর আনন্দ ও খুশির কোমল ঝরণা ধারা।

কেন বইবে না !

রাসূল (সা) হলেন মানুষের মধ্যে সেরা মানুষ। নবীদের মধ্যে সেরা ও শ্রেষ্ঠ নবী। সেই মহামানবের ডাক শুনে কার না হৃদয় আপ্লুত হয় ?

আবু মিহসানও আপ্লুত হলেন রাসূলের (সা) ভালোবাসায়। তাঁর অসীম মানবিকতায়।

তখনও ইসলামের পালে লাগেনি সুবাতাস।

তখনও মসৃণ হয়নি ইসলামের পথ। বরং সে পথে ছিল কাঁটা আর কাঁটা। বলা যায় বন্ধুর গিরিপথ। কঙ্কর ছিটানো। আঁকাবাঁকা।

যারা সাহসী তারাই কেবল সেই পথের যাত্রী হচ্ছেন। ধীরে ধীরে।

এই সাহসীদের সহযাত্রী হলেন আবু মিহসান (রা)।

তিনি ইসলাম কবুল করলেন।

সাথে সাথে তার চারপাশে জ্বলে উঠলো বিরুদ্ধতার আগুন। হিংস্র দাবানল।

তবুও তিনি সিদ্ধান্তে অনড়। অটল ঈমানের ওপর। ঠিক যেন হিমালয় পর্বত।

ইসলাম গ্রহণের পর অনেকের মত তিনিও টিকতে পারলেন না মক্কায়।

মক্কা তার জন্মভূমি। মক্কা তার প্রাণপ্রিয় আবাসভূমি।

তবুও, সেই প্রিয় জন্মস্থান ছেড়ে তিনি হিজরত করলেন মদিনায়।

পেছনে পড়ে রইলো স্মৃতিবাহী শৈশব ও কৈশোরের নগরী।

চেনা-জানা আপনজন আর নিত্যকার হাঁটাচলার পথঘাট।

তবুও তার মনে কষ্ট নেই। দুঃখ নেই। আছে কেবল এক অপার্থিব আনন্দ।

সেটা আল্লাহকে খুশি করার আনন্দ। সেটা রাসূলকে (সা) কাছে পাবার তৃপ্তি। সেটা ইসলামের বিশাল আকাশের নিচে ঠাঁই করে নেবার খুশি।

সেদিনের জন্য এই ধরনের ত্যাগ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ, রাসূল (সা) ও ইসলামকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসলেই কেবল এমন ত্যাগ স্বীকার করা যায়।

আবু মিহসানও তাই করলেন। এটাতো তুচ্ছ ত্যাগ তার কাছে। এর চেয়েও বড় কুরবানী তিনি করেছিলেন। ইসলামের জন্য।

সে সবই তো এখন ইতিহাস হয়ে আছে। সোনালি ইতিহাস।

বদর যুদ্ধ !

সেই কঠিন যুদ্ধের ময়দানে অন্যান্য সাহাবীর সাথে আবু মিহসানও ছিলেন দুর্বার, দুঃসাহসী।

তখন তো ছিল না যুদ্ধের অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। হাতের তরবারি আর বর্শা-এ ধরনের অস্ত্রই সম্বল।

কাফেরদের বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি দুঃসাহসী সত্যের সৈনিক। সংখ্যায় তারা নগণ্য। সমরাস্ত্রও অপ্রতুল। কিন্তু বিশাল তাদের ঈমানী শক্তি।

সেই শক্তি আল্লাহর দেয়া শক্তি।

সেই শক্তি রাসূলের (সা) প্রতি ভালোবাসার শক্তি।

সুতরাং তাদের আর কিসের পরওয়া ?

অন্যান্য বীর মুজাহিদদের সাথে সমান তালে যুদ্ধ করছেন আবু মিহসান।

শত্রুর ব্যূহ ছিন্নভিন্ন করে এগিয়ে যাচ্ছেন ক্রমাগত সামনের দিকে।

যুদ্ধ করতে করতেই হঠাৎ ভেঙ্গে গেল তার হাতের সেই বহু ব্যবহৃত তরবারিটি।

এখন উপায় ?

যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পিঠটান দেবার কথা ভাবতেও পারেন না তিনি। আবার খালি হাতে যুদ্ধ করাও তো সম্ভব নয়। কারণ এটা তো নয় মল্লযুদ্ধের ময়দান।

কী করা যায় ?

ভাবছেন তিনি।

তার অভিপ্রায় এবং আকুতি বুঝলেন দয়ার নবীজী (সা)। তিনি মুহূর্তেই আবু মিহসানের হাতে তুলে দিলেন একটি খেজুরের ছড়ি।

রাসূলের (সা) দেয়া সেই ছড়িটির আগা সুচালো করে তাই দিয়েই তিনি যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন বদরের প্রান্তরে। এবং যুদ্ধের শেষ সময় পর্যন্ত।

বিস্ময়করই বটে !

এটা কীভাবে সম্ভব হলো ?

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) আনুকূল্য পেলে কী না সম্ভব হয় !

শুধু বদর যুদ্ধই নয়, উহুদ, খন্দকসহ সংঘটিত সকল যুদ্ধেই তিনি সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছেন। এই সব যুদ্ধে তার ভূমিকা ছিল অসীম।

হিজরী সপ্তম সনের রবিউল আউয়াল।

আবু মিহসানকে দায়িত্ব দেয়া হলো বনী আসাদের মূলোৎপাটনের জন্য।

তিনি দায়িত্ব পেয়েই তার চল্লিশজনের এক বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলেন। বনী আসাদের বসতি ছিল মদিনার পথে 'গামার' কূপের কাছেই।

বনী আসাদের লোকেরা কীভাবে যেন খবর পেয়ে গেল যে, আসছেন! আসছেন দুঃসাহসী মিহসান তার বিশাল বাহিনী নিয়ে।

ভয়ে তারা ঘাবড়ে গেল। মিহসানকে মুকাবিলা করার সাহস তাদের নেই। ফলে তারা পালিয়ে গেল।

মিহসান সেখানে পৌঁছে তাদেরকে পেলেন না।

যুদ্ধের আগেই যুদ্ধ শেষ !

হাসলেন মিহসান। ভাবলেন, মিথ্যার কোনো সাহস থাকে না। থাকে না কোনো চিরস্থায়ী শক্তি। কিন্তু সত্যের সাহস ও শক্তি অসীম। সত্যের সামনে কীভাবে দাঁড়াবে মিথ্যার বহর ?

আবু মিহসান তার বাহিনী নিয়ে ফিরে এলেন মদিনায়। সাথে করে আনলেন বনী আসাদের ফেলে যাওয়া পরিত্যক্ত দুশো উট ও কিছু ছাগল-বকরী।

এর মধ্যে ইন্তেকাল করেছেন দয়ার নবীজী (সা)।

এলো হিজরী ১২ সন।

এই সময় খলিফা হযরত আবু বকর (রা) খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে নির্দেশ দেন ভন্ড নবী তুলাইহা আসাদীর বিদ্রোহ নির্মূলের জন্য।

খালিদ তার বাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। এই বাহিনীর দু'জন ছিলেন অগ্রসেনানী। একজন আবু মিহসান এবং অপরজন সাবিত ইবন আকরাম।

দু'জনই চলছিলেন বাহিনীর আগে আগে। বুকে তাদের শঙ্কাহীন সাহসের ঢল।

আকস্মিকভাবেই বেধে গেল যুদ্ধ। তুমুল যুদ্ধ।

এক পর্যায়ে শহীদ হলেন সাবিত। আবু মিহসান তখন আরও তীব্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তুলাইহার ওপর। তাকে কাবুও করে ফেলেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তার আর্তচিৎকারে ছুটে এলো তার ভাই সালামা। পাপিষ্ঠ ঝাঁপিয়ে পড়লো আবু মিহসানের ওপর এবং সেই আক্রমণে তিনি শহীদ হলেন।

শহীদ হলেন আবু মিহসান। শহীদ হলেন, কিন্তু তার মৃত্যু হয়নি।

শহীদেরা কি মরেন কখনো ?

না, তারা জীবিত। সর্বদাই জীবিত। আবু মিহসানও বেঁচে আছেন, জেগে আছেন। জেগে আছেন ছড়ির তরবারিধারী সেই দুঃসাহসী স্বর্ণ ঈগল।

মক্কায় আশ্রয় নিয়েছেন মিকদাদ ইবন আমর। আছেন নিজের মধ্যে গুটিয়ে। কিন্তু তার হৃদয় এবং দৃষ্টিটা ছিল উন্মুক্ত।

মক্কা।

মক্কা তখন আলোর বিভায় আলোকিত হয়ে উঠছে ক্রমশ।

কারণ ততোদিনে রাসূল (সা) তাওহীদের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন চারদিকে।

কিন্তু বেশ গোপনে। মাত্র গুটিকয়েক মানুষের মাঝে।

মিকদাদের চারপাশে তখনো অন্ধকার।

কিন্তু তার ভাল লাগে না সেই কুৎসিত পরিবেশ।

কেমন বেরহম সবাই। কেবলি হানাহানি আর রক্তারক্তি। অশান্তির সয়লাব। অনাচারের প্লাবন।

মুক্তির উপায় কি?

ভাবেন মিকদাদ।

ভাবতে ভাবতেই একদিন আকস্মিকভাবে জেনে গেলেন। জেনে গেলেন রাসূলের (সা) কথা।

তাঁর দীনের দাওয়াতের কথা।

জেনে গেলেন, যত সুখ আর নিরাপত্তা– সে কেবল আছে এইখানে, আল্লাহর দীনের ভেতর।

তবে আর দেরি কেন?

না। দেরি নয়।

মিকদাদ ছুটে গেলেন রাসূলের (সা) কাছে। তারপর গ্রহণ করলেন ইসলাম।

ইসলাম গ্রহণ করে তিনি মিথ্যার কুহক থেকে মুক্তি লাভ করলেন। ভাগ্যবান মনে করলেন নিজেকে।

যখনই কালেমা পাঠ করলেন মিকদাদ, তখনই তার বুকের ভেতর প্রবেশ করলো এক প্রশান্তির বাতাস। আর সেই সাথে তুমুল ঢেউ তুললো সাহসী তুফান।

ইসলামের দাওয়াতের কাজ চলছে মক্কায়। গোপনে।

কিন্তু না।

মিকদাদ এতে সন্তুষ্ট নন।

নিজের বিবেক এবং সাহসের সাথেই এ যেন লুকোচুরি খেলা।

এটা তার পছন্দ নয়।

তিনি সরাসরি, সবার সামনেই দিতে চান ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা।

তিনি গ্রহণ করেছেন আল্লাহর বাণী, রাসূলের বাণী, সত্য ও সঠিক পথের দিশা। সুতরাং সেখানে আবার লুকোচুরির কী আছে? হোক না বৈরী পরিবেশ।

তবুও সাহসে বুক বাঁধতে হবে।

সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে আবার কীসের ভয়?

অসামান্য সাহসী মিকদাদ।

ভয় নয়। শঙ্কা নয়। দ্বিধা বা সংকোচও নয়। তিনি সরাসরি মক্কায় ইসলামের দাওয়াতের কাজ শুরু করে দিলেন।

কারুর ভয়ে তিনি ভীতু নন।

মক্কায় তখন চলছে দুশমনদের অকথ্য নির্যাতন।

যারাই সত্যপথের সাথী হচ্ছেন। তাদের ওপরই চলছে নির্যাতনের স্টীম রোলার।

কেউই রেহাই পাচ্ছেন না কাফেরদের হিংস্র থাবা থেকে।

মিকদাদও জানেন সে কথা।

তারপরও তিনি তার সিদ্ধান্তে অনড়। যেন সে এক হেরার পর্বত।

মিকদাদ প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন মক্কায়।

মানুষকে ডাকছেন এক আল্লাহর পথে।

ইসলামের পথে।

রাসূলের (সা) পথে।

কাজটি খুবই কঠিন।

শত্রুরা ক্ষেপে গেল মুহূর্তেই।

কাল যারা ছিল কাছের মানুষ, আপনজন-তারাও দাঁড়িয়ে গেল মিকদাদের বিরুদ্ধে।

যারা তাকে আগে ভালো বাসতো, প্রশংসা করতো, তাদের মুখেও এখন অশ্রাব্য গালি। তাদের হাতে ফুলের বদলে এখন উঠে এসেছে চকচকে তরবারি।

কী এক নির্মম নিষ্ঠুর পরিবেশ!

কী এক দুঃসহ কঠিন পরীক্ষার কাল!

এই দুঃসহ রক্তনদী আর আগুনের পর্বত টপকে ক্রমাগত সামনে এগিয়ে চলছেন দুঃসাহসী কতিপয় সিংহদিল, সত্যপ্রাণ মুজাহিদ।

রাসূল (সা) আছেন তাঁদের সাথে।

শুধু সাথেই নন। রাসূলই (সা) তাদের মহান সেনাপতি। পথপ্রদর্শক।

মক্কার সেই ঘোরতর কঠিন সময়ে মাত্র সাতজন সাহসী পুরুষ প্রকাশ্যে ঈমান গ্রহণের কথা ঘোষণা দিলেন। কাজ করে যাচ্ছেন জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সত্যের পক্ষে।

এই সাতজনের প্রথমজনই হলেন মহান সেনাপতি স্বয়ং রাসূলে মকবুল (সা)।

আর তাঁর বাকি ছয়জন হলেন হযরত আবু বকর, হযরত আম্মার, তার মা সুমাইয়া, হযরত সুহাইব, হযরত বিলাল ও হযরত মিকদাদ।

তারা কেউই পরওয়া করলেন না কাফেরদের অত্যাচার, নির্যাতন, হুমকি কিংবা প্রাণনাশের।

মক্কার সেই কঠিন সময়ে প্রকাশ্যে ঈমান আনার ঘোষণা দেয়াটা সহজ ব্যাপার ছিল না।

এ ছিল এক অসীম সাহসের কাজ।

একমাত্র আল্লাহকেই যারা পরম নির্ভরযোগ্য অভিভাবক, প্রভু বলে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেন, কেবল তারাই এমনি সাহসী ভূমিকা রাখতে পারেন।

ইসলাম গ্রহণের পর মিকদাদ সম্পূর্ণ বদলে গেলেন।

এ যেন রাতের পর সূর্যের উদয়। ঝলমলে দিনের শুভাগমন।

কিন্তু কাফেরদের বুকের জ্বালা এতে করে বেড়ে গেল অনেক গুণে।

তারা এবার আরও কঠিন ও হিংস্র হয়ে উঠলো।

প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দেয়ার কারণে মিকদাদের ওপরও নেমে এলো কাফেরদের নির্যাতনের অগ্নিবৃষ্টি। মুষলধারায়।

রাসূল (সা)!

এক দয়ার সাগর।

তিনি তাঁর প্রিয় সাহাবীর এই নির্যাতন দেখছেন।

নবীজীর (সা) বুকটা বেদনায় ভারী হয়ে উঠলো। তিনি মিকদাদকে হিজরতের নির্দেশ দিলেন।

রাসূলের (সা) নির্দেশেই হিজরতে বাধ্য হলেন মিকদাদ।

হিজরী দ্বিতীয় সন।

এই সময়ই শিরক ও তাওহীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ শুরু হলো।

কুরাইশ বাহিনী পৌছে গেল বদর প্রান্তর।

রাসূল (সা) বুঝলেন, সামনেই কঠিন সময়।

তিনিও বদর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন তাঁর প্রিয় সাথীদের।

এটা ছিল সাহাবীদের জন্য প্রথম পরীক্ষার ক্ষেত্র।

সেনাপতি স্বয়ং রাসূল (সা)।

তিনি তাঁর প্রিয় সাথীদের ঈমানের পরীক্ষা নিতে চাইলেন যুদ্ধে যাবার আগেই।

রাসূল (সা) পরামর্শ চাইলেন সাহাবীদের কাছ থেকে। যুদ্ধের ব্যাপারে।

উপস্থিত সাহাবীরা তাদের নিজ নিজ অভিমত ও রণকৌশল অকপটে ব্যক্ত করলেন রাসূলের (সা) সামনে।

হযরত আবু বকর ও হযরত উমর ফারুক (রা) সহ সকলেই তাদের আত্মত্যাগ ও কুরবানীর বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করলো।

মিকদাদও উপস্থিত আছেন।

এবার তার পালা।

তিনি এবার এক আবেগময় ভাষণে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা বাস্তবায়নে এগিয়ে চলুন। আমরা আপনার সাথে আছি। আল্লাহর কসম! বনী ইসরাইলরা তাদের নবী মূসাকে (আ) বলেছিল ঃ 'তুমি ও তোমার রব দু'জন যাও এবং যুদ্ধ কর। আর আমরা এখানে বসে থাকি'। – আমরা আপনাকে তেমন কথা বলবো না। বরং আমরা আপনাকে বলবো ঃ আপনি ও আপনার রব দু'জন যান ও তাদের সাথে যুদ্ধ করুন। আমরাও আপনাদের সাথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। যিনি সত্যসহ আপনাকে পাঠিয়েছেন সেই সত্তার কসম! আপনি যদি আমাদের 'বারকুল গিমাদ' পর্যন্ত নিয়ে যান, আমরা আপনার সাথে যাব এবং আপনার সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। আমরা আপনার ডানে, বামে, সামনে ও পেছনে সকল দিক থেকে যুদ্ধ করবো। যতক্ষণ না আল্লাহ আপনাকে বিজয় দান করেন।"

মিকদাদের এই দুঃসাহসী উচ্চারণে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো রাসূলের (সা) চেহারা মুবারক।

শুরু হলো বদর যুদ্ধ।

সত্যিই মিকদাদ তার সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন যুদ্ধের ময়দানে।

শত্রুদের মুকাবেলায় সেদিন বদরপ্রান্তে মিকদাদ ছিলেন দুর্দান্ত এক সাহসের ফুলকি। বিদ্যুতের ফলা।

বদর যুদ্ধে মিকদাদই ছিলেন অশ্বারোহী মুজাহিদ। এ কারণে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"একমাত্র মিকদাদই সর্বপ্রথম আল্লাহর রাস্তায় তার ঘোড়া ছুটিয়েছেন।"

এটা তার জন্য সৌভাগ্যের বিষয়ও বটে। বলা যায় এক বিরল সম্মাননাও।

বদর ছাড়াও, খন্দকসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে মিকদাদ অংশগ্রহণ করেছেন। আর প্রতিটি যুদ্ধে রেখে গেছেন তার সাহস, ত্যাগ ও কুরবানীর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হযরত খুবাইবকে মক্কার কুরাইশরা শূলে চড়িয়ে হত্যা করলো নৃশংসভাবে।

খুবাইবের (রা) লাশ রাতের আঁধারে শূল থেকে নামিয়ে আনার জন্য রাসূল (সা) পাঠালেন যুবাইর ও মিকদাদকে।

তারা নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে রাসূলের (সা) নির্দেশ পালনে ছুটে গেলেন এবং সত্যি সত্যিই রাতের আঁধারে খুবাইবের লাশ শূল থেকে নামিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে রওয়ানা দিলেন।

এ ধরনের দুঃসাহস ও ত্যাগের নজির মিকদাদের জীবনে রয়ে গেছে অজস্র।

ইসলাম গ্রহণের কারণে মুখোমুখি হয়েছেন অভাব ও দারিদ্র্যের।

সহ্য করেছেন সীমাহীন নির্যাতন।

জীবনে নেমে এসেছে কত ধরনের অগ্নি-পরীক্ষা!

তবুও।–

তবুও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এতটুকু টলেনি তার ঈমানের পর্বত।

কেন টলবে?

তিনি তো তার জীবনের জন্য একমাত্র আল্লাহ ও রাসূলকেই (সা) গ্রহণ করেছিলেন।

সুতরাং তার আর কীসের ভয়?

কীসের পরওয়া?

হযরত মিকদাদ!–

মূলত তিনি ছিলেন রাসূলের (সা) আদর্শে উজ্জীবিত, ইসলামের এক মহান সাহসী সৈনিক।

আর আমাদের কাছে তো তিনি রয়ে গেছেন প্রেরণার এক জ্বলন্ত উপমা।

সাহসের সোনালি সৈকত। বারুদের তুমুল বৃষ্টি।

মহানবীর (সা) অক্লান্ত শ্রম ও প্রচেষ্টায় ইসলামের আবাদে ফলে-ফসলে ভরে উঠলো গোটা মদিনা।

মদিনা এখন ইসলামের সবুজ ফসলের ক্ষেত। ফলভার বৃক্ষের সমাহার। সুশীতল ছায়াঘন বৃক্ষরাজি। মদিনা মানেই একখন্ড উর্বর ও ফসলি ভূমি।

রাসূল (সা), ইসলাম এবং এক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আহ্বানের ভীত

মজবুত হয়ে উঠেছে মদিনায়।

সেখানকার ধনী, সম্পদশালীরা তো বটেই, খ্যাতিমান গোত্রপতিদের অনেকেই মহানবীর (সা) ডাকে সাড়া দিয়ে বদলে নিয়েছেন তাদের জীবনের পোশাক-আশাক। পুরনো আচার-আচরণ।

ইসলাম মানেই তো এক আলো ঝলমল মহা-দিগন্তের উন্মোচন।

ইসলাম মানেই তো যত শান্তি, তৃপ্তি আর অনিঃশেষ নিরাপত্তা।

যারা হতভাগ্য, তাদের কথা আলাদা।

কিন্তু যারা বিবেকবান তারা তো আর অন্ধের মত চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে পারেন না।

তাদের খোলা আছে এক জোড়া সন্ধানী চোখ।

খোলা আছে বিশাল বুকের চাতাল।

সুযোগ পেলেই তারা সেই বুকের জমিনে ভরে নেন অঢেল প্রশান্তির সুবাতাস।

মদিনার এমনি একটি অভিজাত ও খান্দানী গোত্রের নাম খাযরাজ।

খাযরাজ গোত্রের নাম মদিনার সকল মানুষের মুখে মুখে। ভেসে বেড়ায় তাদের সুখ্যাতি বাতাসের শরীর ছুঁয়ে।

এই বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার শাখার সন্তান আল হারেসা। আব্বার নাম সুরাকা। মায়ের নাম রাবী। তিনি ছিলেন আবার প্রখ্যাত নাদারের কন্যা।

মা রাবী। আশ্চর্য তার জীবনধারা।

আর কী এক উজ্জ্বলতায় ভরা তার ভাগ্য।

তিনি নারী হয়েও প্রিয় রাসূলের (সা) একজন উঁচু স্তরের সাহাবী হবার গৌরব অর্জন করেছিলেন। আবার অন্যদিকে ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী-রাসূলুল্লাহর (সা) খাদেম আসাদ ইবন মালিকের আপন ফুফু।

এমনি একটি আলোকিত-গর্বিত পরিবার ও গোত্রের সন্তান আল হারেসা।

সুতরাং তার জীবনটাকেও তিনি খুব সহজে রাঙিয়ে নিতে পারলেন মায়ের দেখানো পথে।

রাসূলের (সা) ভালোবাসা ও আল্লাহর প্রেমের করুণার বৃষ্টিধারায় তিনি পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে নিলেন আপন আত্মা।

নিজস্ব জগত।

আব্বা সুরাকা।

তার নসিব হয়নি ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হবার। কারণ রাসূলের (সা) মদিনায় আগমনের আগেই তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন।

কিন্তু মা !

তিনি রাসূলের (সা) দাওয়াত পাওয়ার সাথে সাথেই ইসলাম গ্রহণ করলেন।

সাথে আদরের সন্তান আল হারেসাও।

মা এবং ছেলে দুজনই কী অসীম সৌভাগ্যের অধিকারী !

সময় গড়াতে থাকলো কালের পিঠে। সে যেন বাতাসের ঘোড়া। নাকি অন্য কিছু ?

থামে না সময় স্রোত। কেবলই বয়ে চলে কলকল করে। ক্রমাগত সামনের দিকে।

সময়ের হাত ধরেই এক সময় এসে গেল বদর যুদ্ধ।

বদর মানেই তো মুসলমানদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষার ক্ষেত্র।

বদর মানেই তো আগুনের পর্বত। কিংবা উত্তপ্ত লাভাস্তূপ।

এই বদর যুদ্ধে সোৎসাহে অংশ নিলেন আল হারেসা।

রাসূল (সা)। তিনিই এই যুদ্ধের মহান সেনাপতি।

মহান সেনাপতির ছায়াতলে একজন দৃঢ়চিত্ত সৈনিক আল হারেসা।

তিনিও যাচ্ছেন বদর প্রান্তরে।

মহান সেনাপতির নির্দেশ লাভের পরই আদৌ দেরি না করে তিনিই সর্বপ্রথম উঠে বসলেন ঘোড়ার পিঠে।

চলতে শুরু করলেন বদর অভিমুখে।

তাজি ঘোড়ার পিঠে দুঃসাহসী সৈনিক আল হারেসা।

ঘোড়া ছুটছে দুরন্ত গতিতে। টগবগিয়ে।

ঘোড়া দুরন্ত পায়ে উড়ছে পথের ধুলো। মরুভূমির শাদা শাদা বালুর মেঘ।

ক্রমাগত এগিয়ে চলছেন ঘোড়ার পিঠে এক অসীম সাহসী যোদ্ধা আল হারেসা।

সঙ্গে আছেন স্বয়ং সেনাপতি রাসূল মুহাম্মাদ (সা)।

রাসূল (সা) হারেসাকেই তাঁর তত্ত্বাবধায়ক ও পর্যবেক্ষক হিসাবে সঙ্গে করে রেখেছেন।

নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সদা সতর্ক আল হারেসা।

কী সৌভাগ্যবান তিনি!

কী বিশ্বস্ত এবং দায়িত্ববান তিনি!

যার কারণে এই কঠিনতম বদর যুদ্ধের যাত্রা পথে রাসূলের (সা) তত্ত্বাবধায়কের মত গুরুদায়িত্বে অভিষিক্ত হতে পারলেন!

এ ছিল রাসূলের (সা) পক্ষ থেকে পাওয়া হারেসার জন্য এক বিশাল পুরস্কার। যা পৃথিবীর অন্য কোনো সম্পদ কিংবা সম্পদের সাথে তুলনা করা যায় না।

সত্য বটে, একমাত্র আল্লাহর রহমত, রেজামন্দি, মঞ্জুর ও রহমত ছাড়া এ ধরনের সৌভাগ্য অর্জনও সম্ভবপর হয় না।

শুকরিয়া আদায় করলেন আল হারেসা।

হৃদয়ের সকল আকুতি আর অনুভূতি ও আবেগ নিয়ে হাত উঠালেন প্রভুর দরবারে।

আল্লাহপাক তার হৃদয়কে প্রশস্ত এবং শীতল করে দিলেন। রাসূল (সা) তো সাথেই আছেন। সুতরাং তার আর কিসের ভয়?

না, কোনো শঙ্কা কিংবা পরওয়া নয়।

বদর অভিমুখে রাসূলের (সা) সঙ্গে হারেসা এগিয়েই চলেছেন ক্রমাগত।

চলতে চলতে এক সময় তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন আল হারেসা।

বুকে আছে ঈমানের তেজ।

হৃদয়ে আল্লাহ ও রাসূল (সা) প্রেমের সুবাতাস।

মাথার ওপরে আছে রহমত ও বরকতের ছায়া। তবু, তবুও তৃষ্ণার্ত তিনি।

তৃষ্ণার্ত– কারণ, তিনি তো মানুষ।

জাগতিক প্রয়োজন ছাড়া কি কোনো মানুষ বাঁচতে বা চলতে পারে?

চলা সম্ভবও নয়।

মানুষ হিসাবে যা যা দুনিয়ায় প্রয়োজন হয়, তা তো পূরণ করতেই হয়। যেমন ক্ষুধা লাগলে খেতে হয়। পিপাসা পেলে পানি পান করতে হয়। এই প্রয়োজন কখনোই মানুষের পিছু ছাড়ে না।

আল হারেসাও দারুণ পিপাসার্ত হয়ে উঠলেন।

পিপাসায় তার কলিজা শুকিয়ে যাচ্ছে।

তার এখন পানির প্রয়োজন।

তিনি নামলেন ঘোড়ার পিঠ থেকে।

তারপর দ্রুত গতিতে চলে গেলেন একটি ঝরনার কাছে।

ঝরনা!

কী মোহময় ছন্দে ঝিরঝির করে ঝরে পড়ছে ঝরনার পানি।

আহ! কী চমৎকার!

কী স্বচ্ছ!

ঝরনার কাছে যেতেই তৃষ্ণাটা আরও উসকে উঠলো আল হারেসার।

তিনি দ্রুত, খুব দ্রুত হাতে তুলে নিলেন পানি। তারপর মুখে তুললেন।

আহ কী তৃপ্তি!

বুকটা জুড়িয়ে যাচ্ছে আল হারেসার।

তিনি পানি পান করছেন ঝরনা থেকে।

আর তখন, ঠিক তখনই– একটি তীর এসে বিঁধে গেল তার শরীরে!

পাপিষ্ঠ হিব্বান ইবন আরাফার নিক্ষিপ্ত তীর।

তীরবিদ্ধ অবস্থায় ছটফট করছেন আল হারেসা।

গড়িয়ে পড়লো তার হাতে ভরা ঝরনার সুপেয় স্বচ্ছ তৃষ্ণার পানি।

গড়িয়ে পড়লেন তিনি নিজেও।

আর মুহূর্তেই নিস্তেজ হয়ে পড়লো আল হারেসার শরীর।

জাগতিক পিপাসা মিটলো না তার।

পানির তৃষ্ণাটা রয়েই গেল হারেসার।

কিন্তু তার চেয়েও বড় যে পিপাসা সেই শহীদ হবার পিপাসা ও তৃষ্ণা মিটিয়ে দিলেন মহান রাব্বুল আলামীন।

তিনি শহীদ হলেন।

আনসারদের মধ্যে আল হারেসাই প্রথম শহীদ।

সুতরাং এখানেও রয়ে গেল তার অনন্য মর্যাদার আসন।

আল হারেসা ছিলেন মায়ের অত্যন্ত আদরের সন্তান।

তিনিও মাকে ভালোবাসতেন অত্যধিক।

শুধু মাকে ভালোবাসতেন, তাই নয়। তিনি ছিলেন মায়ের ভীষণ অনুগত ও বাধ্য ছেলে।

কেন নয়?

সাহাবী মা, তার ওপর খান্দানী বংশ।

তারই তো আদরের সন্তান! সোনার ছেলে!

আদর-সোহাগে আর ইসলামের সুনিবিড় ছায়ায় ছায়ায় বড় হয়েছেন তিনি।

যেমন মা, তেমনি ছেলে।

সেই আদরের ছেলে, সোহাগে ভরা কলিজার টুকরো। তিনি শহীদ হয়েছেন!

বদর থেকে মদিনায় ফিরে এলেন সেনাপতি রাসূল (সা)।

রাসূলের (সা) ফিরে আসার খবর শুনেই তাঁর কাছে ছুটে গেলেন মা রাবী।

রাসূলকে কাঁদোস্বরে বললেন,

ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আমার ছেলে হারেসাকে আমি কতটা ভালোবাসি, তা আপনি জানেন। সে শহীদ হয়েছে। তাতে আমি খুশি। কিন্তু আমার আশঙ্কা দূর না হওয়া পর্যন্ত আমি কিছুতেই শান্তি ও স্বস্তি পাচ্ছিনে। বলুন, বলুন হে দয়ার নবীজী (সা) আমার হারেসা কি জান্নাতের অধিকারী হয়েছে?

যদি তাই হয় তাহলে আমি সবর করবো হাসি মুখে। ভুলে যাব আমার যত শোকতাপ। আর যদি সে জান্নাতী না হতে পারে তাহলে দেখবেন, আমি কি করি!

রাসূল (সা) খুব মনোযোগের সাথে শুনলেন হারেসার মা রাবীর কথা। তারপর বললেন,

এসব কি বলছো তুমি? জান্নাতের সংখ্যা তো একটা দুটো নয়। জান্নাতের সংখ্যা অনেক। আর তোমার কলিজার টুকরো আল হারেসা সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাত

আল ফেরদৌসেরই অধিকারী হয়েছে।

সত্যিই!

রাসূলের (সা) মুখে ছেলের এই খোশ-খবর শুনেই আনন্দে আত্মহারা মা।

তারপর মৃদু হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন। আর তখন তার মুখ থেকে উচ্চারিত হলো,

সাবাশ! সাবাশ! সাবাশ হে আল হারেসা!

মায়ের হৃদয়ের পুঞ্জিভূত কষ্ট মুহূর্তেই দূর হয়ে গেল।

ছেলের সাফল্যে মায়ের বুকটা আরব সাগরের চেয়েও বিশাল হয়ে গেল।

কেন হবে না! কম কথা নয়, তিনি এখন মর্যাদাসম্পন্ন একজন শহীদের গর্বিত মা।

কী সৌভাগ্য তার!

আল হারেসারও আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিল শহীদ হবার।

শহীদের তৃষ্ণায় তিনি ছিলেন কাতর।

কোনো মুমিন যদি আল্লাহর কাছে একান্তে এমন কিছু চান, তাহলে মহান বারী তায়ালা কি তা মঞ্জুর না করে পারেন? আর যদি তার সাথে যুক্ত হয় রাসূলের দোয়া? তাহলে তো কথাই নেই।

একবার রাসূলের (সা) সাথে পথে দেখা হলো হারেসার।

রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন,

হারেসা! আজ তোমার সকাল হলো কি অবস্থায়?

হারেসা বললেন, এমন অবস্থায় যে, আমি একজন খাঁটি মুসলমান।

রাসূল (সা) বললেন, একটু ভেবে বলো হারেসা। প্রত্যেকটি কথার কিন্তু একটি গূঢ় অর্থ থাকে।

আল হারেসা বিনম্র এবং প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুনিয়া

থেকে আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। আমার রাত কাটে ইবাদাত-বন্দেগীতে। আর দিন কাটে রোযা রেখে। বর্তমান মুহূর্তে আমি যেন নিজেকে আরশের দিকে যেতে দেখতে পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে জান্নাতীরা জান্নাতের দিকে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামের দিকে চলছে।

আল হারেসার এই কথা শুনার পর রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহ্ পাক যে বান্দার অন্তরকে আলোকিত করেন, সে অন্তর আর আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না।

আল হারেসা প্রাণপ্রিয় রাসূলের (সা) কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার শাহাদাতের জন্য একটু দোয়া করুন। শাহাদাতই আমার একান্ত তৃষ্ণার পানি। হৃদয়ের একান্ত আরাধ্য বিষয়।

আল হারেসার তৃষ্ণা আর হৃদয়ের আকুতি দেখে খুশি হলেন দয়ার নবীজী (সা)। তিনি সত্যিই দোয়া করলেন হারেসার শাহাদাতের জন্য।

রাসূলের (সা) দোয়া বলে কথা।

বৃথা যায় কিভাবে?

মহান রাব্বুল আলামীন কবুল করলেন তাঁর হাবীবের দোয়া।

কবুল করলেন আল হারেসার পিপাসিত কামনাও।

অতঃপর শহীদ হলেন তিনি বদরে। আর শাহাদাতের মাধ্যমে পেয়ে গেলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, মহান এবং বিরল এক পুরস্কার।

মূলত শাহাদাতের পিপাসার কাছে অতি তুচ্ছ জাগতিক পিপাসা কিংবা ঝরনার পানি।

আল হারেসা!

তিনি পিপাসা মেটাবার জন্য গিয়েছিলেন ঝরনার কাছে।

হাতে তুলে নিয়েছিলেন তৃষ্ণার পানি।

কিন্তু ঝরনাও হার মানলো।

হার মানলো আল হারেসার শাহাদাতের সুতীব্র পিপাসার কাছে।

এক সম্মানিত মেহমান এসেছিলেন পিপাসা মেটানোর জন্য ঝরনার কাছে।

কিন্তু পারলো না সে!

পরাস্ত হলো ঝরনা।

ঝরনা কাঁদে না তবু।

সে কেবল অপলকে চেয়ে থাকে এক সাফল্যের দ্যুতি জোতির্ময় নক্ষত্রের দিকে। তিনি, সেই নক্ষত্রটি আর কেউ নন- আল হারেসা।

এমনি হয়।

আল্লাহ পাক যাকে কবুল করেন, পৃথিবীর সকল কিছুই পরাস্ত হয়ে যায় তার কাছে।

চারদিকে সাজ সাজ রব।

বেজে উঠেছে যুদ্ধের দামামা।

বদর যুদ্ধ!

কোন্ মুমিন আর বসে থাকে ঘরের কোণে, অলসভাবে?

কোন্ আল্লাহর প্রিয় বান্দা আর হাতছাড়া করতে চায় এই সুবর্ণ সুযোগ?

এমন হতভাগা, কমজোর মুমিন কেউ ছিল না। বরং যুদ্ধের মাদকতায়, জিহাদের নেশায় তখন রাসূলের (সা) সাথীরা মাতোয়ারা।

কে আগে যাবে, কে প্রথম হবে শহীদি মিছিলের সৌভাগ্যের পরশে- সেই প্রতিযোগিতা চলছে সাহাবীদের (রা) মধ্যে।

সবার ভেতর প্রাণচাঞ্চল্য দোলা দিয়ে উঠলো। কি যুবক, কি বৃদ্ধ। এমনকি কিশোরদের মধ্যেও চলছে সেই প্রতিযোগিতার তুমুল তুফান।

রাসূলের (সা) সাথীরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

তারা দাঁড়িয়ে আছেন। সারিবদ্ধভাবে।

সেই সারিতে একটু জায়গা করে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক কিশোর।

কিশোরের হৃদয়ে জিহাদের প্রত্যাশা কেবলই তরঙ্গ তুলছে।

যেন বঙ্গোপসাগরের বিশাল ঢেউ।

সাহসী কিশোর। কিশোর তো নয় যেন উহুদ পর্বত।

বুকে তার আরব সাগরের মত বিশাল ঈমানের তুফান। সাহস ও সংগ্রামে মরুঝড়কেও যেন সে হারিয়ে দিতে পারে।

কিশোর দাঁড়িয়ে আছেন জিহাদী কাফেলার সারিতে।

রাসূল (সা) একে একে দেখে নিচ্ছেন তার জান্নাতী সাহসী ঈমানদের।

দেখছেন আর পরখ করছেন।

দেখতে দেখতে এক সময় রাসূল (সা) পৌঁছুলেন কিশোরের কাছে।

তাকে দেখেই মুচকি হাসলেন রাসূল (সা)।

কিশোরের বুকটি মুহূর্তেই কেঁপে উঠলো। কি এক আশঙ্কায় তিনি দুলে উঠলেন। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বয়স কত?

কিশোর জবাবে বললেন, বার বছর।

রাসূল (সা) আবার হাসলেন। বললেন, তাহলে তো তুমি যুদ্ধে যাবার জন্য উপযুক্ত নও।

রাসূলের কথা শেষ না হতেই কিশোরের চোখদুটো ছল ছল করে উঠলো।

হু হু করে কেঁদে উঠলেন তিনি।

তার হৃদয়ের গভীরে বেদনাটি মোচড় দিয়ে উঠলো।

ফিরে এলেন কিশোর।

ফিরে এলেন একবুক কষ্ট, যন্ত্রণা আর বেদনা নিয়ে।

যুদ্ধে যেতে না পারার কারণে তার হৃদয়ে সেকি বেদনার ঝড়! কালবৈশাখীও হার মানে কিশোরের বুকের ঝড়ের কাছে।

বদর যুদ্ধে অংশ নিতে পারলেন না তিনি। এক সাগর বেদনা নিয়ে তিনি প্রহর কাটান। প্রহর কাটান আর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে থাকেন।

কখন আসবে আবার এরকম সুবর্ণ সুযোগ।

কখন?

অবশেষে এসে গেল। –

এসে গেল উহুদ যুদ্ধ।

কিশোরের বয়স এখন পনের।

এবার দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন জিহাদী কাফেলার সারিতে।

মহান সেনাপতি রাসূল (সা)।

তিনি তাঁর প্রিয় সাথীদেরকে আবারো দেখে নিচ্ছেন খুব ভাল করে।

দেখছেন প্রত্যেককে।

দেখছেন আর যেন টোকা দিয়ে পরখ করে নিচ্ছেন তার প্রত্যেকটি স্বর্ণ খন্ডকে।

ধীরে ধীরে রাসূল (সা) পৌছুলেন আবার সেই কিশোরের সামনে।

রাসূলের (সা) চাহনিতে খুলে গেল কিশোরের হৃদয়ের সবক'টি জানালা-দরোজা। বুকের গভীরে তবুও একটি আশঙ্কা বুদবুদ তুলছে।

সে কেবলি ভয়, না জানি আবার বাদ পড়ে যান তিনি।

কিন্তু না। –

রাসূল (সা) এবার তাকে মনোনীত করলেন।

মনোনীত করলেন উহুদ যুদ্ধের জন্য।

রাসূলের (সা) কাছ থেকে অনুমতি পাওয়া মাত্রই কিশোরের হৃদয়ে সেকি খুশির ঢল! সেকি আনন্দের জলপ্রপাত!

নায়েগ্রার জলপ্রপাতও তার কাছে তুচ্ছ। অতি তুচ্ছ।

মহান আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে শুকরিয়া জানালেন কিশোর। শুকরিয়া জানালেন জিহাদে যাবার সৌভাগ্য অর্জনের জন্য।

সবকিছু প্রস্তুত।

এবার যুদ্ধে যাবার পালা।

এবারই আল্লাহ ও রাসূলের (সা) সমীপে নিজেকে পেশ করার প্রকৃষ্ট সময়ের পালা।

প্রতিটি মুজাহিদের বুকে শাহাদাতের পিপাসা।

প্রতিটি মুমিনই যেন সাওর পর্বত।

যুদ্ধে চলেছেন তারা। –

একপাশে মিথ্যার কালো ছায়া।

অন্য পাশে আলোর মিছিল।

সেনাপতি স্বয়ং রাসূলে খোদা (সা)।

এক সময় বেজে উঠলো যুদ্ধের দামামা।

ইসলামের বীর মুজাহিদরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুশমনদের ওপর।

জীবন বাজি রেখে সবাই যুদ্ধ করে যাচ্ছেন।

এই দুঃসাহসী মুজাহিদদের মধ্যে আছেন সেই পনের বছরের কিশোরটিও।

তিনিও একজন পূর্ণাঙ্গ মুজাহিদের মত সমানে যুদ্ধ করে চলেছেন।

যুদ্ধ করতে করতে হঠাৎ! –

হঠাৎ শত্রুপক্ষের একটি তীর এসে বিঁধে গেল কিশোরটির কচি বুকে।

তীরটি হাড় ভেদ করে ঢুকে গেল তার বুকের গভীরে।

এক সময় শেষ হলো যুদ্ধ।

যুদ্ধ শেষে সেই তীরবিদ্ধ অবস্থায় কিশোরকে আনা হলো রাসূলের (সা) কাছে।

তীরটি তখনো আটকে আছে কিশোরের বুকের ভেতর।

রাসূল (সা) দেখলেন।

রাসূলের চোখে করুণ চাহনি। করুণ করুণ মায়াবী।

মমতার বিন্দু বিন্দু শিশির কণা রাসূলের (সা) চোখেমুখে চিকচিক করছে।

কিশোরটি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বুক থেকে তীরটি আপনিই বার করে দিন।

রাসূল (সা) বললেন, তুমি চাইলে আমি তীরের ফলাটিসহ তোমার বুক থেকে টেনে বার করে আনতে পারি।

আবার তুমি চাইলে আমি শুধু তীরটিই বার করে আনতে পারি। তখন তোমার বুকের ভেতর থেকে যাবে তীরের ফলাটি। যদি ঐ ফলাটি তোমার বুকের ভেতর থেকে যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তোমার জন্য সাক্ষ্য দেব যে, তুমি একজন শহীদ।

শহীদ! –

রাসূলের (সা) মুখ থেকে শহীদ শব্দটি শোনার সাথে সাথেই কিশোরটি আরজ করলেন,

হে রাসূল (সা)! দয়ার রাসূল (সা) আমার! আপনি মেহেরবানি করে কেবল তীরটিই বের করে আনুন। আর ফলাটি থেকে যাক আমার বুকের ভেতর।

যেন কিয়ামতের দিন আপনার পবিত্র জবানের সাক্ষ্য আমার নসীব হয় যে, আমি শহীদ!

শহীদ–

সেটাই তো আমার জীবনের চরম চাওয়া। পরম পাওয়া। বিশ্বাস করুন রাসূল (সা)! শহীদ হওয়া ছাড়া আমার জীবনের আর কোনো প্রত্যাশা নেই। নেই আর কোনো পিপাসা।

রাসূল (সা) বুঝলেন কিশোরের ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ভাষা। বুঝলেন তার শাহাদাতের আবেগ, অনুভূতি।

তিনি তৎক্ষণাৎ একটানে কিশোরের বুক থেকে বার করে আনলেন তীরটি।

আর তীরের ফলাটি রয়ে গেল কিশোরের বুকের গভীরে।

রাসূলের (সা) সাক্ষ্যের জন্য।

উহুদ যুদ্ধের পর খন্দকসহ সংঘটিত সকল যুদ্ধেই তিনি অংশ নিয়েছিলেন সেই ক্ষত-বিক্ষত বুক নিয়ে। হাসি মুখে।

আর সেকি অসীম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে গেছেন প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে!

এমন কি রাসূলের (সা) ইন্তেকালের পরও তিনি জিহাদে অংশ নিয়েছেন।

অংশ নিয়েছেন সিফফীনের যুদ্ধেও। আলীর (রা) পক্ষে।

কিন্তু এভাবে আর কতদিন?

একদিন বুকের সেই ক্ষতস্থানে পচন ধরে তিনি ইন্তেকাল করলেন।

ইন্তেকাল করলেন বটে, কিন্তু তার বুকে তখনো রয়ে গেল রাসূলের সাক্ষীর প্রতীক সেই তীরের ফলাটি।

বস্তুত এই হলো একজন মুমিনের শহীদি তামান্না। শহীদি পিপাসা।

এই অসীম সাহসী কিশোরের নাম– রাফে ইবন খাদীজ।

আল্লাহর রাসূল (সা) যার শাহাদাতের স্বয়ং সাক্ষ্যদাতা ।

হযরত রাফে!

কি সৌভাগ্যবান এক দুঃসাহসী আলোচিত মানুষ ছিলেন তিনি!
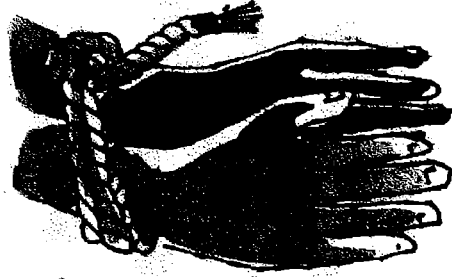
তিনি বেড়ে উঠেছেন সম্ভ্রান্ত এবং মহান এক পরিবারে।

এমন খান্দানি পরিবার–যার নামডাক ছড়িয়ে পড়েছে দূর থেকে বহু দূরে।

নাম- রিফায়া।

পিতার সাথে বের হলেন তিনি। তারপর মক্কায় গিয়ে আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াতে অংশগ্রহণ করলেন পিতার সাথে। বাইয়াত করলেন রাসূলের (সা)

পবিত্র হাতে।

রাসূলের (সা) হাত!

যে হাতে রয়ে গেছে মহান বারী তা'য়ালার যাবতীয় কল্যাণ, বরকত ও রহমত।

রাসূলের (সা) সেই পবিত্র হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন রিফায়া।

যার ওপর সৌভাগ্যের পরশ ধারা ঝরে, এমনি করেই ঝরে। অঝোর ধারায়। শ্রাবণের বৃষ্টির মত।

রাসূলের সময়ে সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধেই অংশ নিয়েছেন রিফায়া।

শুধুই কি অংশ নেয়া?

না। প্রতিটি যুদ্ধেই রেখেছেন তিনি তার সাহস, ঈমান আর বীরত্বের স্মারক চিহ্ন।

এলো বদর।

কঠিনতম এক পরীক্ষার প্রান্তর বদর।

যুদ্ধ চলছে সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে।

আলো এবং আঁধারের ।

ন্যায় এবং অন্যায়ের মধ্যে।

ঈমান এবং কুফরীর মধ্যে।

এই ভয়াবহ যুদ্ধে অন্যান্য সাহাবীদের সাথে আছেন অসীম সাহসী যোদ্ধা রিফায়া।

তিনিও লড়ে যাচ্ছেন সাহসের সাথে।

জানবাজি রেখে। প্রাণপণে।

শত্রুর মুকাবেলায় রিফায়া যেন আগুনের কুন্ডলি।

বারুদস্তম্ভ।

ক্রমাগত সামনে এগিয়ে চলেছে রিফায়া।

ক্রমাগত।

শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে ঘোড়া দাবড়িয়ে ছুটে চলেছেন রিফায়া।

সামনে তার কেবল শাহাদাতের স্বপ্ন।

বিজয়ের স্বপ্ন।

যুদ্ধের সেনাপতি স্বয়ং রাসূলে করীম (সা)।

পেছনে রয়েছে পড়ে শঙ্কা আর যাবতীয় ক্লান্তির বহর।

তার তো এখন পেছনে তাকাবার কোনো ফুরসতই নেই।

একটানা যুদ্ধ করে চলেছেন রিফায়া।

যুদ্ধ করতে করতে হঠাৎ শত্রুদের নিক্ষিপ্ত একটি তীর এসে বিঁধে গেল তার দ্যুতিময় চোখের ভেতর।

চোখে আঘাত হেনেছে তীর।

কিন্তু বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই তার সেদিকে।

রাসূল!

দয়ার রাসূল (সা) এগিয়ে এলেন রিফায়ার কাছে। গভীর মমতায় চোখের ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন রাসূল (সা) তাঁর পবিত্র একটু থু থু।

তারপর দুয়া করলেন প্রিয় সাহাবীর জন্য। প্রভুর দরবারে।

আর কী আশ্চর্য!

সাথে সাথে ভাল হয়ে গেল রিফায়ার আহত চোখটি।

রিফায়া আবারো ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুর মুকাবেলায়।

বদর যুদ্ধে তার সাথে একই কাতারে লড়ছেন আপন দুই ভাই খাল্লাদ ও মালিকও।

বদর প্রান্তর সেদিন এই তিন ভায়ের দৃপ্তপদভারে কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

আর ভয়ে ও আতঙ্কে মোচড় দিয়ে উঠছিল কাফেরদের কালো কালো হৃদয়গুলো।

কিন্তু ব্যতিক্রম হলো তার পুত্র ওয়াহাবের বিষয়টি।

তারই পুত্র ওয়াহাব।

পিতা রিফায়া লড়ছেন সত্যের পক্ষে।

আর পুত্র ওয়াহাব যুদ্ধ করছে শত্রুপক্ষে।

কী বিস্ময়কর এক ঘটনা!

একই যুদ্ধের ময়দান।

পিতা আর পুত্র- উভয়েই ভিন্ন শিবিরে।

দুজনই মুখোমুখি।

দুজনই তার কাফেলার বিজয় প্রত্যাশী।

কিন্তু পারলো না ওয়াহাব।

পারলো না সে পিতাকে পরাস্ত করতে।

সেটা সম্ভবও নয়।

ফলে পরাস্ত হলো ওয়াহাব।

এবং নিজের পিতা রিফায়ার হাতে বন্দি হলো ওয়াহাব।

পুত্র ওয়াহাবকে নিজ হাতে বন্দি করতে এতটুকুও হাত কাঁপেনি রিফায়ার।

কাঁপেনি তার বুক কিংবা স্নেহের দরিয়া।

এযে সত্য-মিথ্যার লড়াই।

রিফায়া জানেন, ভালো করেই জানেন-

এই যুদ্ধ সত্য-মিথ্যার যুদ্ধ।

এখানে তুচ্ছ রক্তের বাঁধন।

এখানে মূল্যহীন আবেগ আর জাগতিক সম্পর্ক।

সত্য কেবল ইসলাম।

সত্য কেবল আল্লাহর হুকুম।

সত্য কেবল নবীর (সা) মুহাব্বত।

এবং সত্য কেবল ঈমানের দাবি পূরণ করা।

পিতার হাতে বন্দি পুত্র।

কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেল বাতাস।

থেমে গেল মেঘ এবং পাখির চলাচল।

সবাই অবাক বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখলো এক অভাবনীয় দৃশ্য।

দেখলো আর ভাবলো, একেই বলে ঈমানের শক্তি।

একেই বলে প্রকৃত মুজাহিদ।

যেখানে সত্যের কাছে তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ হয়ে যায় একান্ত রক্তের বাঁধন। সন্তানের পরিচয়ও।

প্রকৃত অর্থে, আল্লাহ পাক তো এমনই ঈমান প্রত্যাশা করেন তাঁর প্রিয় বান্দার কাছে।

রাসূল (সা) তো চান এমনই শর্তহীন ভালবাসা।

আর ইসলাম তো চায় এমনই ত্যাগ, কুরবানি ও ঈমানের দুঃসাহসিক গরিমা।

হযরত রিফায়া।

রিফায়া পুত্রকে বদর প্রান্তরে নিজ হাতে বন্দি করে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন ইসলামের সোনালি ইতিহাসে।

বিরল দৃষ্টান্ত!

অথচ প্রেরণাদায়ক আমাদের জন্য।

প্রেরণাদায়ক প্রতিটি মুমিনের ক্ষেত্রে সকল সময় ও কালের জন্য।

হযরত হুদ (আ)।

তিনি ছিলেন হযরত নূহ (আ)-এর অধস্তন পঞ্চম পুরুষ।

পাপ আর অন্যায়ের জন্য মহান রাব্বুল আলামীন নূহ (আ)-এর কওমকে গজবে নিপতিত করেন। মহা প্লাবনে ধ্বংস হয়ে যায় তারা– যারা কখনো ঈমান আনেনি। আর বেঁচে রইলো তারা– যারা ঈমান এনেছিল আল্লাহর প্রতি এবং নূহের (আ) প্রতি।

নূহ (আ)-এর বেঁচে যাওয়া সেই মানবগোষ্ঠী ইরামের বংশধারা পর্যন্ত একই বংশোদ্ভূত থাকে।

ইরামের মধ্যে গড়ে উঠলো দুটি শাখা। একটির নাম আদ, আর অপরটির নাম সামুদ।

মহান আল্লাহ আদ জাতির জন্য নবী হিসাবে নির্বাচন করলেন হুদকে (আ)। আর সামুদ জাতির নবী হলেন হযরত সালেহ (আ)।

আদ এবং সামুদ জাতির জন্য এই দুইজন নবী ছিলেন একই সময়ে। এটা ছিল আল্লাহ পাকেরই এক বিশেষ মর্জি।

আরও মজার বিষয় হলো- হযরত হুদ এবং সালেহ (আ) একই সাথে হজ্ব আদায় করতে গিয়েছিলেন। তাদের হজ্বের বিবরণ দিতে দিয়ে রাসূল (সা) হযরত আবু বকরকে (রা) বলেন, 'এই আসফান উপত্যকা দিয়েই হুদ এবং সালেহ (আ) আতিকের (বাইতুল্লাহর) হজ্ব করতে গিয়েছিলেন। তারা যাবার সময় আসফান উপত্যকার ওপর এসে 'লাব্বাইক' তালবিয়া বলেছিলেন। তাদের পরণে কম্বলের লুঙ্গি এবং গায়ে ছিল পালক অথবা চামড়ার চাদর।'

হুদ (আ) ছিলেন আদ জাতির জন্য আল্লাহর মনোনীত নবী।

তিনি তাঁর জাতিকে সকল সময় ডাকতেন আল্লাহর পথে।

সত্যের পথে।

আলো ও ন্যায়ের পথে।

কুরআন মজীদে আল্লাহ পাক 'হুদ' নামে একটি সূরা নাযিল করেছেন। এই সূরার বিভিন্ন আয়াত থেকে জানা যায় হুদ (আ)-এর দাওয়াত ও বিবিধ বিষয় সম্পর্কে। যেমন সূরা হুদের ৫০ থেকে ৫৭ নম্বর আয়াতে হুদ (আ)-এর দাওয়াত সম্পর্কে আল্লাহপাক বলছেন "আদ জাতির জন্য আমি তাদের ভাই হুদকে নবী মনোনীত করলাম।

হুদ বললো, 'হে আমার জাতি! আল্লাহর আইন মেনে চলো। তিনি ছাড়া

আর কোনো ইলাহ নেই। তোমরা শুধু মিথ্যাই রচনা করে যাচ্ছো। আমি তোমাদের কাছে পারিশ্রমিক চাই না। আমার দাওয়াতের বিনিময়ে আল্লাহ পাকই আমাকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। হে আমার জাতি! তোমাদের অপরাধের গুনাহ মাফ চেয়ে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত কর। তিনি তোমাদের প্রতি রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য বাড়িয়ে দিতে থাকবেন।"

হুদ (আ) তাঁর জাতিকে বুঝাতে চাইলেন ঃ

"পাপপ্রবণ অবাধ্য জাতির মত তোমরা আমার কথার অবাধ্য হয়ে আল্লাহর দিকে বিনীতচিত্তে ফিরে আসতে অনীহা পোষণ করো না।"

হুদ (আ)-এর আকুল আহ্বানে তার জাতির মানুষ বললো ঃ

"তুমি তোমার নবী হবার কোনো প্রমাণই আমাদের সামনে পেশ করছো না। সুতরাং তোমার কথা মেনে নিয়ে আমরা আমাদের মাবুদগুলোকে বর্জন করতে পারি না। আসল কথা হলো, আমাদের কোনো একজন দেবতা তোমাকে বদ আছর করেছে।"

কি বদনসিব আদ জাতির!

তারা সত্যকে বুঝতেই চাইলো না। বরং উদ্ভট বাহানা আর অজুহাত দাঁড় করালো।

তবুও হতাশ হলেন না হুদ (আ)। ভেঙ্গে পড়লেন না তাদের অশুভ আচরণে।

তিনি আদ জাতির এইসব কথার জবাবে বললেন ঃ

"আমি আল্লাহ পাককে সাক্ষী রাখলাম।

সাক্ষী থাকো তোমরাও।

তোমরা যেসব কল্পিত বস্তু আল্লাহর সাথে শরীক করছো, সে সবকে আমি ঘৃণা করি। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তোমরা সবাই একত্রিত হয়েও আমার

কোনো ক্ষতি করতে চাইলেও তা পারবে না। আমাকে কোনো সুযোগই দিও না।

আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করছি।

আল্লাহপাক আমারও প্রতিপালক, তোমাদেরও প্রতিপালক।

এই জমিনে জীবিত সকল প্রাণের অস্তিত্বই তাঁর হাতের মুঠোয়।

আমার রব অবশ্যই ন্যায়ের পক্ষে আছেন। সুতরাং তোমরা মানতে না চাইলে আমার কিছুই করার নেই। আমার কাছে যেসব ঘোষণা এসেছে, সেসব আমি তোমাদেরকে শুনিয়ে দিয়েছি।

মনে রেখ, আমার প্রতিপালক তোমাদের জায়গায় অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করে নেবেন। তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে আমার রব এমন যে, সবকিছু তাঁর নখদর্পণে রয়েছে।"

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বললেন, "তারপর আমার চূড়ান্ত ফায়সালা যখন তাদের উপর এসে গেল তখন হূদকে এবং হূদের ঈমানদার সাথীদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম সেই এক ভয়াবহ শাস্তি থেকে।"

হূদ (আ)-এর জাতিটা ছিল ধনে-বলে ও শক্তিতে সমৃদ্ধ। এজন্য তাদের মধ্যে ছিল অহমের তুফান।

তারা কোনো কিছুই পরোয়া করতো না।

তারা এক আল্লাহর ইবাদাত ছেড়ে পূজা করতো কল্পিত দেবতার। শিরক, বিদআত আর অন্যায়ের সয়লাবে তারা ভেসে চলছিল।

ভেসে গেল তাদের মানবতাবোধ, সুনীতি, ইনসাফ, দয়ামায়া কিংবা ভ্রাতৃত্ববোধ।

এক আল্লাহর আনুগত্য বাদ দিয়ে তারা মানবতাহীন জুলুম অত্যাচারে মেতে উঠলো।

তারা এতটুকুও কান দিল না আল্লাহর সাবধান বাণীর দিকে। কান দিল না আদ (আ)-এর কথায়ও।

আদ (আ) তাঁর জাতিকে আলোর পথ দেখানোর জন্য চেষ্টা চালালেন আপ্রাণ।

কতভাবে বুঝাতে চেষ্টা করলেন তাঁর জাতিকে।

কিন্তু কিছুতেই তারা ফিরে এলো না আল্লাহর পথে।

নবীর নির্দেশিত পথে।

আসলে দুর্ভাগারা এমনি হয়।

তাদের নসিবে কখনো শান্তি জোটে না।

আদ জাতির জন্যও তাই হলো।

তারা যখন পাপের সাগরে নিমজ্জিত হলো, যখন আল্লাহ পাক ও নবীর বিরুদ্ধাচরণ শুরু করলো, তখন– ঠিক তখনি তাদের ওপর নেমে এলো ঢলের মত বিশাল গজব। আল্লাহর পক্ষ থেকে এই গজব ছিল তাদের কর্মেরই প্রাপ্য প্রতিফল।

হযরত হুদ (আ) তাঁর জাতিকে বড় ভালবাসতেন।

ভালবাসতেন তাঁর জাতির প্রতিটি মানুষকে প্রাণ দিয়ে।

সেইজন্য তিনি চেয়েছিলেন তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তি।

তিনি দু'হাত তুলে তাঁর জাতির হেদায়েতের জন্য আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করেছেন।

অথচ, এই অকৃতজ্ঞ জাতিই তাঁকে কষ্ট দিয়েছে নানাভাবে।

তবুও হুদ (আ) কি এক গভীর মমতায় তাদেরকে বললেন :

"আমার দায়িত্ব ছিল তোমাদেরকে বলা। তোমাদেরকে আমি সবই বলেছি। তারপরও তোমরা যদি না শোনো, তাহলে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হবে।"

তবুও শুনলো না তারা। বরং হুদের (আ) ওপর তাদের জুলুম-অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল।

হুদের (আ) বিরুদ্ধে তারা শেষতম আঘাত হানতে প্রচেষ্টা চালালো। কিন্তু আল্লাহপাকেরই ঘোষণা অনুযায়ী তারা হুদের (আ) কোনো ক্ষতিই করতে পারলো না।

বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত প্রবল ঘূর্ণিঝড়টি এলো। সেই ঝড়ে আদ জাতির সকল দর্প ও অহঙ্কারের পর্বত মুহূর্তেই ধূলিসাৎ হয়ে গেল। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তারা।

কেবল অক্ষত অবস্থায় বেঁচে রইলেন আদ (আ) এবং তাঁর ঈমানদার সঙ্গীরা। এটা ছিল আল্লাহপাকেরই পূর্ব ঘোষিত সিদ্ধান্ত। সেটাই প্রতিফলিত হলো।

সূরা আল আরাফের ৭১ নম্বর আয়াতে আল্লাহপাক বলছেন ঃ

"সে (হুদ) তার জাতিকে বললো ঃ তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও শাস্তি তোমাদের ওপর নির্ধারিত হয়ে আছে।"

একই সূরার ৭২ নম্বর আয়াতে আল্লাহপাক আরও বলছেন ঃ "আর আমার অভিসম্পাত তাদের (আদ জাতির) সঙ্গে এই দুনিয়ায় রইলো, কিয়ামতেও রইলো। জেনে রাখ (হে নবী আদম)! আদ জাতি রহমত থেকে দূরে সরে গেল। তারা ছিল হুদের জাতি।"

কিভাবে ধ্বংস হলো এই প্রবল প্রতাপশালী জাতি? সবই আল্লাহপাকেরই শান। তিনিই তো সর্বশক্তির উর্ধ্বে বড় এক মহাশক্তিধর।

তাঁর শক্তির সাথে অন্য কোনো শক্তিরই তুলনা চলে না।

তারই দৃষ্টান্ত রয়ে গেল আদ জাতির ওপর।

মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ পাক বলছেন ঃ "আর আদ জাতিকে ঘূর্ণিবায়ু দিয়ে বিধ্বস্ত করা হয়েছে। সে ঘূর্ণিবায়ুকে সাত আট দিন ধরে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। সেই সময় তাদেরকে যদি দেখতে পেতে তাহলে তুমি

দেখতে যে, তারা এমনভাবে ভূপাতিত হচ্ছে, যেন তারা খেজুরের কর্তিত ডাল। আজ তাদের কাউকে বেঁচে থাকতে দেখতে পাচ্ছ কি?"

আদ জাতির নিপতিত সেই ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়টি কেমন ছিল?

সহীহ হাদিসে এর কিছুটা বিবরণ পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে :

"সেই সময় আকাশের বুকে আদ জাতির মানুষ আর তাদের কুকুরগুলো চিৎকার করছিল।

বৃষ্টির মত পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো।

আকাশে উঠে যাওয়া মানুষগুলো ভূ-পৃষ্ঠে পড়লো। পড়ার সময় তাদের মাথা খাড়াভাবে নিচের দিকে ছিল। তাই পড়ার পরপরই তাদের মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাদের দেহগুলো থেতলে পড়ে রইলো।

সেই থেতলে যাওয়া দেহ ও মাথার ওপর ঝর ঝর করে পড়ছিল ওপর থেকে পাথর খন্ড। পাথরের আঘাতে তাদের দেহগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তারপর সেগুলো দীর্ঘ পাহাড় আর পাথুরে মাটির ছাইয়ের নিচে ঢেকে গেল। পৃথিবীর বুক থেকে এমনিভাবে বিলীন হয়ে গেল।" (ইবনু কাসীর)

বস্তুত আল্লাহর শক্তিই বড় শক্তি।

যে কোনো শক্তিকেই তিনি মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। আর তাঁর সাথে কুফরী, শিরক ও বেয়াদবির পরিণাম!– সেতো এক ভয়াবহ অধ্যায়। যেমন তিনি দেখিয়েছেন নূহ (আ)-এর জাতিকে। দেখিয়েছেন আদ ও সামুদ জাতিসহ অনেককেই।

সত্য বলতে, এভাবেই আল্লাহর শাস্তি নিপতিত হয় অবাধ্য জাতির ওপর, আর রহমত, বরকত ও সার্বিক নিরাপত্তায় সুস্থির রাখেন তাঁর অনুগত বাধ্য সাহসী প্রিয় বান্দাদের।

যায়িদ ইবন সাবিত।

বয়সে একেবারেই কিশোর।

রাসূল (সা) যখন প্রথম হিজরত করেন মদিনায়, তখন যায়িদের বয়স মাত্র এগার বছর।

রাসূল (সা) তখনও মদিনায় পৌছেননি।

অথচ রাসূলের (সা) ওপর বিশ্বাস এনে ইসলাম কবুল করলেন এগার বছরের এই কিশোর।

ইসলাম গ্রহণের পরপরই তিনি শুরু করলেন কুরআন অধ্যয়ন।

বয়সে কিশোর।

কিন্তু নিয়মিত কুরআন পড়ার কারণে মদিনার মানুষ তাকে সম্মানের চোখে দেখতো।

যায়িদ ইবন সাবিত ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী।

এতই প্রখর ছিল তার মেধা যে, মাত্র এগার বছর বয়সে, রাসূল (সা) মদিনায় আসার আগেই তিনি সতেরটি সূরার হাফেজ হয়েছিলেন।

যায়িদের স্মৃতিশক্তিও ছিল দারুণ।

আল কুরআনের যেটুকু পড়তেন, তা সবই মুখস্থ রাখতে পারতেন।

রাসূল (সা) হিজরত করে মদিনায় এলেন।

তিনি মদিনায় পা রাখার পরই মদিনার মানুষ যায়িদকে সাথে করে নিয়ে গেল রাসূলের (সা) দরবারে।

রাসূল (সা) তাকে দেখেই বুঝে গেলেন যে, এ এক অসাধারণ মেধাবী কিশোর। আর রাসূল (সা) যখন জানলেন যে, এই কিশোর সতেরটি সূরার হাফেজ হয়ে গেছেন ইতিমধ্যেই, তখন তো তাঁর বিস্ময়ের আর সীমা রইলো না।

রাসূল (সা) অসম্ভব খুশি হলেন এই সংবাদে।

এরপর রাসূল (সা) স্বয়ং তাকে কুরআন তিলাওয়াত করতে বললেন। যায়িদ রাসূলের (সা) আদেশ পালন করলেন।

তার কণ্ঠে আল কুরাআনের সহীহ তিলাওয়াত শুনে মুগ্ধ হলেন রাসূল (সা)।

মদিনায় আছেন রাসূল (সা)।

প্রতিদিনই এসময় তাঁর কাছে আসতে থাকে বিভিন্ন এলাকা থেকে চিঠিপত্রের বহর।

এর মধ্যে আছে পার্শ্ববর্তী দেশ ও এলাকার রাজা-বাদশার, গোত্রপতি, আমির-উমরাহদের চিঠি।

অধিকাংশ চিঠির ভাষাই ছিল সুরইয়ানী ও ইবরানী (হিব্রু)।

মদিনায় তখন এই দু'টি ভাষা জানতো কেবল ইহুদিরা।

কিন্তু ইহুদিরা কখনই মুসলমানকে ভালো চোখে দেখতো না। বরং দুশমনী করাই ছিল তাদের প্রধানতম কাজ।

মদিনার মুসলমানরাও এই দু'টি ভাষা জানতো না।

ফলে বেশ সমস্যা দেখা দিল।

কি করা যায়?

ভাবছেন রাসূল (সা)।

হঠাৎ তিনি ডাকলেন যায়িদ ইবন সাবিতকে।

কাছে, একান্ত কাছে ডেকে নিয়ে রাসূল (সা) যায়িদকে বললেন ভাষা দু'টি শিখে নেবার জন্য।

রাসূলের (সা) নির্বাচন!

যায়িদ নিজেই বলছেন সেই স্মৃতিবাহী ঘটনার কথা।

'রাসূল (সা) মদিনায় এলে আমাকে তাঁর সামনে হাজির করা হলো। তিনি আমাকে বললেন, 'যায়িদ, আমার জন্য তুমি ইহুদিদের লেখা শেখ। আল্লাহর কসম! তারা আমার পক্ষ থেকে ইবরানী ভাষায় যা কিছু লিখছে, তার ওপর আমার আস্থা হয় না।' রাসূলের (সা) নির্দেশে আমি ইবরানী ভাষা শিখলাম। মাত্র আধা মাসের মধ্যে এতে দক্ষতা অর্জন করে ফেললাম। তারপর রাসূলুল্লাহর (সা) ইহুদিদেরকে কিছু লেখার দরকার হলে আমিই লিখতাম এবং রাসূলকে (সা) কিছু লিখলে আমিই তা পাঠ করে শুনাতাম।'

হযরত যায়িদ!

কি অসাধারণ ছিল তার মেধা এবং স্মরণ শক্তি।

তার এই মহান গুণের জন্য, এই দক্ষতা অর্জনের জন্য রাসূল (সা) যাবতীয় লেখালেখির দায়িত্ব অর্পণ করেন যায়িদের ওপর।

যায়িদ আরবি ও ইবরানী- দুই ভাষাতেই লিখতেন।

রাসূলের (সা) সর্বপ্রথম সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন উবাই ইবন কাব আল আনসারী।

আর উবাই-এর অনুপস্থিতিতে রাসূলের (সা) এই মহান দায়িত্ব পালন করতেন যায়িদ ইবন সাবিত।

তারা ওহী ছাড়াও লিখতেন রাসূলুল্লাহর (সা) চিঠিপত্র।

রাসূলের (সা) ওফাত পর্যন্ত যায়িদ এই দায়িত্ব পালন করেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে।

রাসূলের (সা) ওফাতের পর- হযরত আবুবকর ও হযরত উমরের (রা) খিলাফত কালেও যায়িদ এই দায়িত্ব পালন করেন।

রাসূলের (সা) সময়ে যখন চিঠিপত্র কিংবা ওহী লেখার প্রয়োজন হতো, তখন যায়িদ হাড়, চামড়া, খেজুরের পাতা প্রভৃতি ব্যবহার করতেন।

পবিত্র আল কুরআনই ইসলামের মূল ভিত্তি। এই পবিত্র আল কুরআন সংগ্রহ ও সংকলনের মহা গৌরবজনক সম্মানের অধিকারী হযরত যায়িদ ইবন সাবিতও।

রাসূলের ওফাতের পর, প্রথম খলিফা হযরত আবুবকরের (রা) সময়ে আরব উপদ্বীপে একদল মানুষ মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগ করা) হয়ে মুসায়লামা আল কাজ্জাবের দলে যোগ দেয়।

মুসায়লামা ইয়ামামায় নিজেকে নবী বলে ঘোষণা করে।

হযরত আবুবকর (রা) তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

যদিও এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে এবং মুসায়লামা মুসলিম বাহিনীর হাতে নিহত হয়– তবে যুদ্ধে একে একে শহীদ হয়ে যান সত্তরজন হাফেজে কুরআন।

একটি যুদ্ধে এত বিপুল সংখ্যক হাফেজে কুরআনের শাহাদাত কুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে হযরত উমরকে (রা) শঙ্কিত করে তোলে।

তিনি খলিফা হযরত আবুবকরকে (রা) আল কুরআন সংরক্ষণের জন্য তা লিপিবদ্ধ করার জন্য বিশেষভাবে পরামর্শ দেন।

হযরত আবুবকর (রা) হযরত উমরের (রা) এই পরামর্শ গ্রহণ করেন।

তিনি আল কুরআন লিপিবদ্ধ করার জন্য আহ্বান জানালেন যায়িদ ইবন সাবিতকে। বললেন, 'তুমি একজন বুদ্ধিমান নওজোয়ান। তোমার প্রতি সবার আস্থা আছে। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবিতকালে তুমি ওহী লিখেছিলে। সুতরাং তুমিই এই কাজটি সম্পাদন কর।'

হযরত আবুবকরের (রা) প্রস্তাবটি শোনার পর যায়িদ তার অনুভূতি ব্যক্ত করলেন এইভাবে ঃ

'আল্লাহর কসম! তারা আমাকে আল কুরআন সংগ্রহ করার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা করার চেয়ে একটি পাহাড় সরানোর দায়িত্ব দিলে তা আমার কাছে অধিকতর সহজ হতো।'

আল কুরআন সংরক্ষণের কাজে হযরত যায়িদকে সহযোগিতার জন্য আবুবকর (রা) আরও একদল সাহাবাকে দিলেন। দলটির সংখ্যা ছিল পঁচাত্তর। তাদের মধ্যে উবাই ইবন কাব ও সাঈদ ইবনুল আসও ছিলেন।

যায়িদ খেজুরের পাতা, পাতলা পাথর ও হাড়ের ওপর লেখা আল কুরআনের সকল অংশ সংগ্রহ করলেন। এরপর হাফেজদের পাঠের সাথে তা মিলিয়ে দেখলেন।

যায়িদ নিজেও একজন আল কুরআনের হাফেজ ছিলেন এবং রাসূলের (সা) জীবিতকালে আল কুরআন সংগ্রহ করেছিলেন।

হযরত যায়িদ!

কি সৌভাগ্যবান এক আলোর জ্যোতি।

রাসূলের (সা) ওহী লেখার দায়িত্ব যে বিশেষ সাহাবীদের ওপর ছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন যায়িদ ইবন সাবিত।

যায়িদ সকল সময় রাসূলের (সা) সাহচর্যে থাকার চেষ্টা করতেন।

রাসূলের (সা) পাশে যখন বসতেন তখন কলম, দোয়াত, কাগজ, খেজুরের পাতা, চওড়া ও পাতলা হাড়, পাথর ইত্যাদি তার চারপাশে প্রস্তুত রাখতেন। যাতে করে রাসূলের (সা) ওপর ওহী নাযিলের সাথে সাথেই তিনি তা লিখতে পারেন।

রাসূলের (সা) প্রতি ছিল যায়িদের সীমাহীন ভালোবাসা। ছিল তাঁর প্রতি শর্তহীন আনুগত্য।

যায়িদের এই ভালোবাসার কারণে তিনি সকল সময় চেষ্টা করতেন প্রাণপ্রিয় রাসূলের (সা) কাছাকাছি থাকার জন্য।

ভোরে, যখন ফর্সা হয়নি দূরের আকাশ, যখন কিছুটা অন্ধকারে ঢেকে থাকতো সমগ্র পৃথিবী, ঠিক সেই প্রত্যুষে নীরবে, অতি সন্তর্পণে যায়িদ পৌঁছে যেতেন দয়ার নবীজীর দরবারে।

কখনো বা পৌঁছে যেতেন সেহরীর সময়ে।

দয়ার নবীজীও প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন যায়িদকে।

বিস্ময়করই বটে!

রাসূলকে (সা) দেখার আগেই যায়িদ মাত্র এগার বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করলেন। শুধু তাই নয়, সতেরটি সূরারও হাফেজের অধিকারী হলেন।

যখন বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তখন যায়িদের বয়স মাত্র তের বছর।

তার প্রবল ইচ্ছা ও বাসনা ছিল যুদ্ধে যাবার।

কিন্তু বয়স কম থাকার কারণে তাকে অনুমতি দেননি মহান সেনাপতি রাসূল (সা)।

কিন্তু যখন উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হলো, তখন যায়িদের বয়স ষোল বছর।

এখন কে আর তাকে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত রাখে!

না, কেউ তার গতিরোধ করেননি।

যায়িদ প্রবল প্লাবনের মত তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে যোগ দিলেন উহুদ যুদ্ধে।

যুদ্ধ করলেন প্রাণপণে। সাহসের সাথে।

যুদ্ধের ময়দানে যায়িদ। ষোল বছরের এক টগবগে যুবক।

যুবক তো নয় যেন আগুনের পর্বত, বারুদের ঘোড়া!

কম কথা নয়!

মাত্র এগার বছরে ইসলাম গ্রহণ।

সতেরটি সূরার হাফেজে কুরআন।

কাতেবে ওহীর মর্যাদা লাভ।

রাসূলের (সা) সেক্রেটারি হবার গৌরব অর্জন।

জিহাদের ময়দানে এক সাহসী তুফান।

রাসূলের নির্দেশে দু'টি নতুন ভাষা শেখার আনন্দ।

সম্পূর্ণ হাফেজে কুরআন।

রাসূলের (সা) একান্ত সাহচর্য ও ভালোবাসা লাভ– এসবই হযরত যায়িদের জন্য নির্মাণ করেছে মর্যাদাপূর্ণ এক গৌরবজনক সুশীতল হাওয়ার গম্বুজ।

যায়িদের (রা) মত এমন সৌভাগ্যের অধিকারী ক'জন হতে পারে?

তারাই হতে পারে সফল, যাদের হৃদয়ে আছে ঈমান, সাহস, ত্যাগ আর ইসলামের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা।

তীব্র পিপাসায় কাতর তিনি।

তার বুকটা যেন সাহারা মরুভূমি।

কিসের পিপাসা?

কিসের তৃষ্ণা?

সে তো কেবল জিহাদের।

সে তো কেবল শাহাদাতের।

হ্যাঁ, এমনি তীব্রতর পিপাসা বুকে নিয়ে তিনি কেবলই ছটফট করছেন।

হৃদয়ে তার তুমুল তুফান।

চোখের তারায় ধিকি ধিকি জ্বলে আরব মহাসাগর।

কোথায়?

কতদূর?

আর কত অপেক্ষা?

এ প্রতীক্ষা বড় কষ্টের। বড়ই যন্ত্রণার।

তিনি ছুটে গেলেন প্রশান্তির মহাসাগর দয়ার নবীর (সা) কাছে।

খুব মিনতির সুরে বললেন, দেখুন দয়ার রাসূল (সা), আমাকে দেখুন। কেমন অস্থির হয়ে আছে আমার হৃদয়। হৃদয় তো নয়, যেন ধু ধু পোড়া মাঠ। চৈত্রের দাবদাহ। হে রাসূল, আপনি আমার পিপাসা মেটান।

পিপাসা!

এ পিপাসা বড় কঠিন পিপাসা।

এ পিপাসা বড় সুন্দর পিপাসা।

কিন্তু হলে কি হবে?

তার জন্য তো বয়স পূর্ণতার প্রয়োজন।

রাসূল তো কেবল রাসূলই নন।

তিনি একজন সেনাপতিও বটে। কত দিকে খেয়াল রাখতে হয় তাঁর।

রাসূল দেখছেন পিপাসিত এক কিশোরকে।

তিনি পিপাসিত বটে, কিন্তু তার পিপাসা মেটাবার মত তখনো বয়স হয়নি। তবুও তার আরজির মধ্যে কোনো খাদ নেই।

নেই এতটুকু কৃত্রিমতা।

রাসূল (সা) এবার ভালো করে চেয়ে দেখলেন তাকে। তারপর মৃদু হেসে কোমল কণ্ঠে বললেন,

তুমি জিহাদে যেতে চাও, ভালো কথা। কিন্তু জিহাদে যাবার মত তোমার তো এখনও সেই বয়সই হয়নি!

তবুও নাছোড় তিনি। বললেন, সামনেই উহুদ যুদ্ধ। দয়া করে এই যুদ্ধে যাবার অনুমতি দিন হে দয়ার রাসূল (সা)।

রাসূল আবারও হাসলেন। বললেন, না। তা হয় না। এত অল্প বয়সে যুদ্ধে যেতে চাইলেও আমি সেটার অনুমতি দিতে পারি না। তুমি ফিরে যাও।

রাসূলের (সা) দরদী কণ্ঠের সুধা পান করে তিনি ফিরে এলেন।

ফিরে এলেন, কিন্তু বুকের ভেতর তৃষ্ণাটা রয়েই গেল আগের মত।

মাঝে মাঝেই সেটা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়।

দিন যায়। প্রহর গড়ায়।

সময়ের সাথে সাথে তার পিপাসাটাও বেড়ে যায়।

কেবলই ভাবছেন, কবে কখন আসবে আমার জন্য সেই মোহনীয় কাল? কবে? প্রতিটি প্রহর তো মহাকালের মত মনে হচ্ছে?

না, এরপর আর বেশিদিন তাকে অপেক্ষা করতে হলো না। এসে গেল সেই প্রতীক্ষিত দিন।

উহুদের পর এলো খন্দকের যুদ্ধ।

উহুদের যুদ্ধে তিনি বয়স কম হবার কারণে যেতে পারেননি। রাসূল (সা) অনুমতি দেননি। কিন্তু এবার?

খন্দকের যুদ্ধ।

এটাও দারুণ গুরুত্বপূর্ণ এক যুদ্ধ।

এই যুদ্ধে যাবার জন্য তিনি রাসূলের (সা) অনুমতি চাইলেন।

রাসূল (সা) এবার তাকে অনুমতি দিলেন।

রাসূলের (সা) সম্মতি লাভের পর আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। মনে হলো তিনি এমন এক দুর্লভ সম্পদ লাভ করেছেন, যার মূল্য গোনার মত শক্তি কারো নেই।

সেই তো শুরু।

এরপর আর পেছন ফিরে তাকাননি তিনি।

যখনই জিহাদের ডাক এসেছে, তখনই তিনি বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে গেছেন। আর প্রশান্ত ও পরিতৃপ্তির সাথে বলেছেন, আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত হে দয়ার নবীজী।

রাসূল (সা) যুদ্ধ করেছেন উনিশটি। তার মধ্যে সতেরটি যুদ্ধেই শরীক হয়েছিলেন এই দুঃসাহসী মুজাহিদ। আর কি বিস্ময়কর ব্যাপার, প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি ছিলেন সমান সাহসী।

মুজাহিদ তো নয়, যেন বিদ্যুতের তেজ। বাতাসের ঘোড়া! হাওয়া দু'ভাগ করে তার তরবারি থেকে কেবলি ঠিকরে বেরুচ্ছে আগুনের ফুলকি।

মূতার যুদ্ধ!

যুদ্ধের সকল প্রস্তুতি শেষ।

তিনিও চললেন যুদ্ধের ময়দানে।

সঙ্গে আছেন আর এক দুঃসাহসী মুজাহিদ।

সম্পর্কে চাচা।

কিন্তু তিনি দুধারী তরবারির অধিকারী। দুটোতেই সমান দক্ষ। কোনোটার চেয়ে কোনোটাই কম নয়।

একটি তার যুদ্ধের তরবারি, আর অন্যটি তার কলম।

হ্যাঁ, কবি তিনি। বিখ্যাত কবি। তার কবিতার ফলায়ও সমান বিদ্ধ হয়

কাফের, মুশরিক, আর অগণিত ইসলামের দুশমন।

নাম তার আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা।

তিনি রাসূলের (সা) একজন উঁচুমানের সাহাবী।

আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা।

তিনিও চলেছেন মূতার যুদ্ধে।

একটি মাত্র উট।

সেই উটে আরোহণ করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়ারা। তার সাথে একই উটের দ্বিতীয় আরোহী তারই ভাতিজা, টগবগে এক মুজাহিদ।

চাচা-ভাতিজা।

কেউ কারো চেয়ে কম নয়।

কম নয় তাদের শাহাদাতের পিপাসা।

দু'জনই সমানে সমান।

উট এগিয়ে চলেছে ক্রমাগত সামনের দিকে।

পিঠে তার দু'জন দুঃসাহসী মুজাহিদ।

চাচা নামকরা এক বিখ্যাত কবি।

উটের পিঠে চলতে চলতে তিনি আবৃত্তি করছেন কবিতা।

ভাতিজা তার মুগ্ধ শ্রোতা।

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার কবিতার এক জায়গায় ছিল শাহাদাতের তীব্র স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার কথা। সেই অংশটুকু শুনেই কাঁদতে শুরু করলেন সাথী ভাতিজা।

তিনি কাঁদছেন!

ভয়ে নয়।

শঙ্কায় নয়।

দুর্বলতায় নয়।

তবুও তিনি কাঁদছেন ক্রমাগত।

কিন্তু কেন?

বুঝে ফেললেন চাচা কবি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা।

তার কান্নার কারণ বুঝে ওঠার সাথে সাথেই চাচা ছড়ি ঝাঁকিয়ে রাগের সাথে বললেন,

“ওরে ছোটলোক! আমার শাহাদাতের ভাগ্য হলে তোর ক্ষতি কি?”

যেমন চাচা, তেমনি ভাতিজা!

শাহাদাতের পিপাসায় দু’জনই সমান কাতর।

ভাতিজার শাহাদাতের পিপাসা মেটেনি বটে, তবে মিটেছিল জীবনের পিপাসা।

কারণ, তিনি ছিলেন রাসূলের (সা) প্রিয়জন, একান্ত আপন।

রাসূলের স্নেহে তিনি ছিলেন ধন্য।

তিনি যেমন রাসূলকে (সা) ভালবাসতেন প্রাণ দিয়ে, তেমনি রাসূলও (সা) তাকে মহব্বত করতেন অঢেল, অনেক।

কে তিনি?

কে তিনি?

যিনি ছুঁতে পেরেছিলেন আল্লাহ ও রাসূলের (সা) ভালোবাসার পর্বতের চূড়া?

তিনি তো আর কেউ নন–

এক দুর্বিনীত দুঃসাহসী বাতাসের ঘোড়া– যায়িদ ইবন আরকাম।

মহান মেজবান
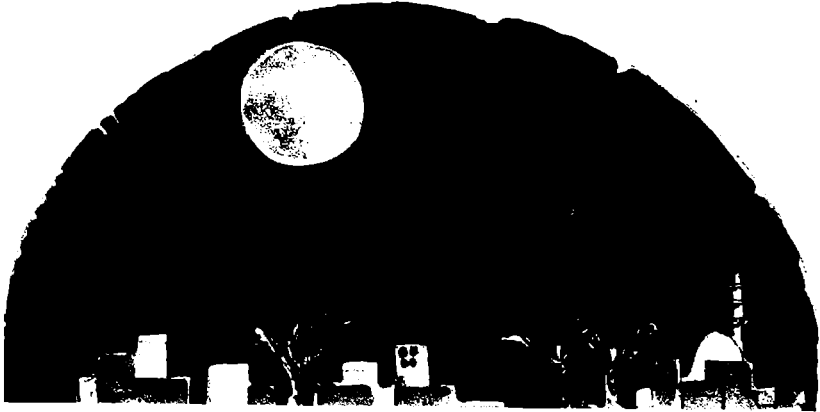
একটি প্রশান্তময় গৃহ।

ছায়াঘেরা শান্ত সুনিবিড়।

কল্যাণ আর অফুরন্ত আলোর রোশনিতে সীমাহীন উজ্জ্বল।

কার বাড়ি? কোন্ বাড়ি?

আঙ্গুল উঁচিয়ে দেখিয়ে দেন সবাই।

ঐতো মদিনার সেই বাড়ি, যে বাড়িতে প্রথমে পবিত্র পা রেখেছিলেন নবী মুহাম্মাদ (সা)।

মহান আলোকিত রাসূল! রাসূলের (সা) সঙ্গে ছিলেন সেদিন তাঁরই সাথী হযরত আবুবকর (রা)।

হ্যাঁ, সেইদিন।

যেদিন রাসূল (সা) আবুবকরকে নিয়ে পৌঁছুলেন মদিনায়।

মদিনার কুবা পল্লী।

চারপাশ তার স্নিগ্ধ, শান্ত।

কী এক মোহময় পরিবেশ।

অসীম তার মায়ার বন্ধন।

রোশনীতে আলো ঝলমল। যেন সোনার মোহর ছড়িয়ে আছে পূর্ণিমা জোছনায়।

চক চক করছে কুবা পল্লীর প্রতিটি ধূলিকণা।

ধূলিকণা!

তাও যেন রূপ নিয়েছে একেবারে খাঁটি সোনায়। একেবারেই খাদহীন।

কে জানে না কুবা পল্লীর নাম?

কে চেনে না তার পথঘাট, গলি-প্রান্তর?

সবাই চেনে।

সবাই জানে।

জানে এবং চেনে মদিনা ও মক্কার প্রতিটি মানুষ।

কেন চিনবে না?

কুবা পল্লী তো বুকে ধারণ করে আছে এক উজ্জ্বল ইতিহাস, ইতিহাসের চেয়েও মহান এক সত্তা।

আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের অনুমতি পেলেন দয়ার নবীজী (সা)।

এটাই প্রথম হিজরত!

রাসূল (সা) চলেছেন অতি সন্তর্পণে। সামনের দিকে।

সাথে আছেন বিশ্বস্ত বন্ধু হযরত আবুবকর (রা)।

রাসূল (সা) ছেড়ে যাচ্ছেন তাঁর প্রিয় জন্মভূমি মক্কা।

সেই মক্কা!

যেখানে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন সাগর সমান রহমত নিয়ে।

যেখানে কেটেছে তাঁর শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের দিনগুলো।

কত স্মৃতি, কত কথা, কত ঘটনাপ্রবাহ মনে পড়ছে দয়ার নবীজীর (সা)।

তিনি হাঁটছেন আর পেছনে তাকাচ্ছেন।

দয়ার নবীজীর ভারী হয়ে উঠলো স্মৃতিবাহী হৃদয়।

তাঁকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে ভালোবাসার মক্কা!

মক্কা থেকে রাসূল (সা) চলেছেন মদিনার দিকে। এটাই আল্লাহর মঞ্জুর।

এটাই প্রথম হিজরত।

মদিনার উপকণ্ঠে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে কুবা পল্লী।

বহু পূর্ব থেকেই কুবা পল্লীর রয়েছে ঐতিহ্যঘেরা সুনাম ও খ্যাতি।

আল্লাহর প্রিয় হাবীব রাসূলে মকবুল (সা) ও তাঁর সাথী আবুবকর কুবা পল্লীতে পৌঁছেই একটু থমকে দাঁড়ালেন।

তারপর।

তারপর তিনি এবং তাঁর সাথী প্রবেশ করলেন কুবা পল্লীর অতি খান্দানী একটি বাড়িতে।

বাড়িটি কার?

কে সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি?

তিনি আর কেউ নন। নাম কুলসুম ইবনুল হিদম (রা)।

রাসূলও (সা) দারুণ পছন্দ করলেন বাড়িটি। এখানেই তিনি তাঁর সাথী আবুবকরসহ কাটিয়ে দিলেন একে একে চারটি দিন।

কুলসুম ইবনুল হিদমের (সা) বাড়িতে চারদিন থাকার পর দয়ার নবীজী (সা) পৌঁছুলেন মদিনার মূল ভূখণ্ডে।

এখানে এসে রাসূল (সা) ও আবুবকর (রা) অবস্থান করেন আর এক সৌভাগ্যবান সাহাবী আবু আইউব আল আনসারীর বাড়িতে।

কিন্তু রাসূল (সা) মদিনায় পদধূলি দিয়েই যার বাড়িতে উঠলেন, তিনিই কুলসুম ইবনুল হিদম।

রাসূল (সা) উপস্থিত তার বাড়িতে!

কি অসীম সৌভাগ্যের ব্যাপার!

আনন্দ আর ধরে না তার হৃদয়ে।

খুশিতে বাগবাগ।

কিযে করবেন রাসূলের (সা) জন্য, কিভাবে যে বরণ করে নেবেন এই মহিমান্বিত মেহমানকে। দিশা করতে পারছেন না কুলসুম ইবনুল হিদম (রা)।

মুহূর্তেই তিনি হাঁকডাক শুরু করলেন। ডেকে জড়ো করলেন বাড়ির চাকর-বাকরকে।

ডাক পেয়েই ছুটে এলো সকলেই। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল নাজীহ। কুলসুম নাজীহকে তার নাম ধরে ডাক পাড়লেন।

রাসূলের (সা) কানে গেল নামটি।

নাজীহ্ অর্থ সফলকাম।

রাসূল (সা) নামটি শুনেই সাথী আবুবকরকে (রা) বললেন, হে আবুবকর! তুমি সফলকাম হয়েছো।

এই বাড়িতে শুধু রাসূলই (সা) নন। সেই সময় রাসূলের (সা) অনেক সঙ্গী-সাথীই মেহমান হিসাবে তার বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন।

যেমন রাসূল (সা) ও আবুবকর (রা) কুলসুমের (রা) বাড়িতে অবস্থানের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হলেন মক্কার পথ পেছনে ফেলে আলী ও সুহাইব (রা)।

তাঁরাও অবস্থান করলেন কুলসুমের (রা) বাড়িতে।

এছাড়াও তার বাড়িতে উঠেছিলেন মক্কা থেকে আগত রাসূলের (সা) একান্ত সাথী আবু মাবাদ আল মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা), যায়িদ ইবন হারিসা (রা), আবু মারসাদ কান্নায ইবন হিসন (রা), আবু কাবশা (রা) প্রমুখ সাহাবী।

চরম দুঃসময়ে কুলসুম এইভাবে খুলে রেখেছিলেন তাঁর বাড়ির দরোজা নবীর (সা) সাথীদের জন্য।

রাসূল (সা) মদিনায় আছেন।

মক্কা থেকে একে একে অনেকেই এসেছেন সেখানে হিজরত করে।

খুব কাছের সময়।

মদিনায় তৈরি হচ্ছে মসজিদে নববী। সেই সাথে তৈরির কাজ চলছে রাসূলের (সা) বিবিদের আবাসস্থল।

তখন।

ঠিক তখনই ইন্তেকাল করলেন কুলসুম ইবনুল হিদম (রা)।

রাসূলের (সা) মদিনায় আগমনের পর কোনো আনসারী সাহাবীর (রা) এটাই প্রথম ইন্তেকাল!

স্বাভাবিকভাবেই রাসূল (সা) ব্যথিত হলেন।

কিন্তু কুলসুম!

না। এতটুকুও কষ্ট পেলেন না কুলসুম ইবনুল হিদম (রা)।

বরং তিনি এক প্রফুল্ল চিত্তে, মহা খুশি ও আনন্দের মধ্যেই চলে গেলেন, জীবনের ওপারে।

কেন তিনি কষ্ট পাবেন?

কেন তিনি ব্যথিত হবেন?

তাঁর তো রয়েছে সাথে রাসূলের (সা) ভালোবাসা। রয়েছে তার চেয়ে অনেক অধিক সম্পদ। রাসূলের (সা) মেজবান হবার, প্রথম সৌভাগ্যের পরশ।

সফল তিনি।

সফল আশ্চর্য এক মহান মেজবান কুলসুম ইবনুল হিদম দুনিয়া ও আখেরাতে।

এক দুঃসাহসী সাহাবীর নাম- আবু লুবাবা।

রাসূলের (সা) সাথে অধিকাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আবু লুবাবা।

বদর যুদ্ধের সময় তিনি বিশেষভাবে সম্মানও লাভ করেন।

বদর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত মুসলিম বাহিনী।

যুদ্ধের মহান সেনাপতি স্বয়ং রাসূলে করীম (সা)। সৈনিকের চেয়ে বাহনের সংখ্যা কম।

সুতরাং একেকটি উটের পিঠে তিনজন করে মুজাহিদ।

সেই নিয়মের রাসূলের (সা) ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হলো না।

রাসূল (সা) এখানেও দেখালেন সমতা ও মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

রাসূলের (সা) উটের ওপরও তিনজন সওয়ারী।

রাসূল (সা) ছাড়াও তাঁর উটে সওয়ার হলেন আবু লুবাবা ও আলী (রা)।

তাঁরা পালা করে উটের পিঠে ওঠানামা করছিলেন। রাসূল (সা) ও আলী যখন উটের পিঠে, তখন উটের রশি হাতে হেঁটে চলছেন আবু লুবাবা।

এইভাবেই চলছে।

পথ অতিক্রম করছেন সত্যের মুজাহিদ।

এক সময় পালা এলো রাসূলের (সা)। উটের পিঠে বসবেন আবু লুবাবা এবং আলী (রা)।

আর রশি হাতে হেঁটে চলবেন স্বয়ং সেনাপতি রাসূল (সা)।

এতে রাসূল (সা) খুশি হলেও কেঁদে উঠলো আবু লুবাবার কোমল হৃদয়। কেঁদে উঠলো তার বিবেক। তিনি আরজ করে বিনয়ের সাথে বললেন, হে রাসূল (সা)! দয়ার নবীজী আমার! দয়া করে আপনি উটের পিঠে বসুন। আমি রশি হাতে হেঁটে চলি।

রাসূল (সা) শুনলেন আবু লুবাবার কথা। একটু হাসলেন। তারপর বললেন,

তোমরা আমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী নও। আর এমনও নয় যে, তোমাদের চেয়ে আমার বেশি সওয়াবের প্রয়োজন নেই। অতএব তোমরা দু'জন উটের পিঠে বসো। আর আমি রশি হাতে হেঁটে চলি।

এই হলো দয়ার নবীজীর (সা) সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের নমুনা।

এই হলো রাসূলের (সা) মানবতাবোধ। পৃথিবীর এমন কোনো শাসক, সেনাপতি কিংবা নেতা নেই, যিনি রাসূলের (সা) চেয়ে বেশি মানবতা প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছেন।

আবু লুবাবা নিজের জীবনের চেয়েও অধিক ভালবাসতেন রাসূলকে (সা)। তাঁকে ভালবাসতেন পৃথিবীর সকল কিছুর বিনিময়ে।

রাসূল (সা) ঠিক তেমনি মহব্বত করতেন আবু লুবাবা- এই সত্যের সৈনিককে।

এজন্য হিজরি দ্বিতীয় সনের শাওয়াল মাসে মদিনার ইহুদি গোত্র বনু কায়নুকার সাথে সংঘটিত যুদ্ধে এবং একই সনের জিলহজ্জ মাসে সংঘটিত 'সাবীক' যুদ্ধে আবু লুবাবা যোগদান করতে পারেননি।

কারণ এই সময় রাসূল (সা) তাকে মদিনায় স্থলাভিষিক্ত করেন।

রাসূল (সা) পনের দিন যাবত বনু কায়নোকা অবরোধ করে রাখেন।

এই সময় আবু লুবাবা মদিনায় ইমারাত বা প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন।

রাসূলের (সা) পক্ষ থেকে এই বিরল সম্মানের অধিকারী হলেন আবু লুবাবা।

আবু লুবাবার ঈমান ছিল পর্বতের মত অটুট। শক্ত। সামান্য ভুলের কারণেও তিনি মহান বারী তায়ালার কাছে এমনভাবে মাগফিরাত কামনা করতেন, যা ছিল সত্যিই বিরল।

একবার এমনি একটি ভুলের কারণে নিজে অনুতপ্ত হয়ে ছুটে গেলেন মসজিদে নববীতে।

এরপর একটি মোটা ও ভারী বেড়ি দিয়ে নিজেই নিজেকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে ফেললেন। তারপর নিজেই ঘোষণা দিলেন : যতক্ষণ আল্লাহপাক আমার তওবা কবুল না করেন, ততোক্ষণই এভাবে বাঁধা অবস্থায় থাকবো।

এভাবে কতদিন বাঁধা ছিলেন আবু লুবাবা?

কারো মতে দশ, আবার কারো মতে বিশ দিন-রাত।

এসময়ে জরুরি প্রয়োজনে যেমন নামাজ ও অন্যান্য প্রয়োজনে তার স্ত্রী তাকে বেড়ি খুলে দিতেন।

আবার প্রয়োজন মিটে গেলেই বেড়ি বেঁধে নিতেন।

এই অবস্থায় আবু লুবাবা আহার-পানাহার প্রায় ছেড়েই দিলেন। এতে করে তার শ্রবণ শক্তি কমে যায়। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে। আর দুর্বলতায় শরীর ভেঙ্গে যায়। দুর্বলতার কারণে একদিন তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

তবুও নিজেকে মুক্ত করলেন না আবু লুবাবা।

রাসূল (সা) জানেন সবকিছু। তিনিও অপেক্ষায় আছেন মহান রাব্বুল আলামীনের নির্দেশের। রাসূলে করীম (সা) আছেন উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু সালামার (রা) ঘরে।

তখন শেষ রাত।

প্রভাতের আগেই নাযিল হলো আয়াত।

রাসূল (সা) হেসে উঠলেন।

রাসূলের (সা) হাসি দেখে উম্মু সালাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে সকল সময় খুশি রাখুন। বলবেন কি আপনার হাসির কারণ কী?

রাসূল (সা) বললেন, আবু লুবাবার তওবা কবুল হয়েছে।

উম্মু সালামা জানতে চাইলেন, আমি কি এই সুসংবাদটি মানুষকে জানাতে পারি?

তখনো হেজাব বা পর্দার আয়াত নাজিল হয়নি। রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ উম্মু সালামা, তুমি এই সুসংবাদটি সবাইকে জানাতে পারো।

রাসূলের (সা) সম্মতি পেয়ে তিনি হুজরার দরোজায় দাঁড়িয়ে সকলকে বিষয়টি জানালেন।

উপস্থিত সবাই ছুটে গেলেন আবু লুবাবাকে মুক্ত করার জন্য।

আবু লুবাবা তার সিদ্ধান্তে অটল। বললেন, না কক্ষনো নয়। রাসূল (সা) নিজে এসে যতক্ষণ আমার বেড়ি খুলে না দেবেন, ততোক্ষণই এভাবে থাকবো।

রাসূল (সা) ফজরের নামাজ আদায়ের জন্য এলেন মসজিদে। আর তখনই তিনি নিজে হাতে বেড়ি খুলে দিলেন আবু লুবাবার।

তওবা কবুল হওয়ায় দারুণ খুশি হলেন আবু লুবাবা।

হিজরী ৮ম সনে মক্কা বিজয় অভিযানে বনু আমর ইবন আওফের ঝান্ডা ছিল হযরত আবু লুবাবার হাতে।

এছাড়াও, রাসূলের (সা) সময়ে সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধেই অংশ নিয়েছিলেন আবু লুবাবা।

যুদ্ধের ময়দানে তিনি ছিলেন সকল সময়ই দুঃসাহসী এবং দুর্বার।

আবার যুদ্ধের বাইরে তিনি ছিলেন একজন বড় আবেদ।

আল্লাহ এবং রাসূলের (সা) মহব্বতে তিনি তার জীবনটি উৎসর্গ করে দেন।

আবু লুবাবা ছিলেন ইসলামের পূর্ণ অনুসারী।

কুরআন ও সুন্নাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতেন পূর্ণভাবে। সেখানে কোনোরকম দুর্বলতার স্থান ছিল না।

কম কথা নয়, আবু লুবাবার তওবা কবুল হওয়ার ঘোষণা সম্বলিত আয়াত নাযিল করেছেন মহান রাব্বুল আলামীন।

এমন সৌভাগ্য কয়জনের হয়?

যাদের হয় তারা সবাই জ্যোতির অধিক।

হযরত আবু লুবাবা (রা)।

সারাটি জীবন যিনি মিথ্যার শেকল গলিয়েছেন সত্যের শিখায়।

আর শেষ পর্যন্ত যিনি হয়ে উঠেছেন খাঁটি সোনা। সোনার মখমল।

হযরত আবদুল্লাহ।

এক মহান সৈনিক।

তার চোখ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসতো সত্যের দ্যুতি। সুন্দরের ঔজ্জ্বল্য।

আবদুল্লাহ ইসলামের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

উৎসর্গ করেছিলেন আল্লাহ এবং রাসূলের (সা) মহব্বতে।

তাঁদের ভালবাসায়।

আবদুল্লাহর সেই ভালবাসায় কোনো খাঁদ ছিল না। ছিল না কোনো কৃত্রিমতা।

কী এক গভীর ভালবাসায় পিতার দশ বছর আগেই হযরত আবদুল্লাহ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

আবদুল্লাহর পিতার নাম আমর।

আমরও পুত্রের ইসলাম গ্রহণের দশ বছর পর ইসলাম কবুল করলেন।

পিতা এবং পুত্র– দু'জনই এখন ইসলামের খাদেম।

আল্লাহ এবং রাসূলের (সা) জন্য, ইসলামের জন্য নিজেদের জানমালকে উৎসর্গ করলেন।

দু'জনই মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদিনায় হিজরত করলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর আবদুল্লাহ তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় রাসূলের (সা) সাহচর্যে ব্যয় করেন।

তিনি লেখাপড়া জানতেন।

এজন্য রাসূলের কাছে থাকা অবস্থায় দয়ার নবীজী যখন যাই বলতেন, তিনি সাথে সাথেই তা লিখে রাখতেন। হোক না তা রাসূলের (সা) রাগান্বিত কিংবা শান্ত অবস্থায়।

কোনো কোনো সাহাবী আবদুল্লাহকে বলতেন, রাসূল (সা) স্বাভাবিক বা শান্ত অবস্থায় যা বলেন সেটা লেখ। কিন্তু তাঁর রাগান্বিত অবস্থার কথাগুলো কি লিখে রাখা ঠিক? এমনটি না করাই ভাল।

বিষয়টি রাসূল (সা) জানার পর তিনি আবদুল্লাহকে বললেন, কেন লিখবে না? অবশ্যই লিখবে। আমার সকল কথাই তুমি হুবহু লিখতে পার। কারণ, সত্য ছাড়া আমি আর কিছুই বলিনে, বলতে পারিনে।

এই হলো আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূলের (সা) চরিত্র।

কী অপরিসীম জোছনার পেলব!

কী তার রূপ-বৈচিত্র্য!

যিনি, যে মহান সেনাপতি এমন হন, সঙ্গত কারণে তাঁর সৈনিক বা সাথীদের

চরিত্রও কলুষমুক্ত, ভয়হীন, স্বপ্ন জাগানিয়া হওয়াই স্বাভাবিক।

আবদুল্লাহও ছিলেন এমনি এক সাহসী সৈনিক।

তিনি সত্য ছাড়া আর কিছুই বুঝতেন না।

আবদুল্লাহ রাসূলের (সা) সান্নিধ্যে এমনভাবে ছিলেন, যেন মৌচাকে বসে আছে কোনো মৌমাছি।

দয়ার নবীজীও (সা) আবদুল্লাহকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। তাকে গুরুত্বও দিতেন সমান।

আবদুল্লাহ তার পিতার চেয়েও বেশি ভালবাসা পেয়েছেন রাসূলের (সা)।

কেন পাবেন না?

আবদুল্লাহ প্রায় সারাক্ষণই রাসূলের (সা) সান্নিধ্যে থাকতেন। এরপরও যদি একটু সময় পেতেন, সেটুকু তিনি ব্যয় করতেন দিনে রোজা রেখে এবং রাতে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে।

তিনি আল্লাহর ইবাদাতে এত বেশি মগ্ন হয়ে যেতেন যে, নিজের দুনিয়াবী সকল চাওয়া-পাওয়া, আহার-নিদ্রা, এমনকি স্ত্রী, সন্তান, পরিবারও তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যেত।

তিনি অন্য কোনো দিকে খেয়াল করার ফুরসতটুকু পেতেন না।

ছেলের এমন অবস্থা দেখে আবদুল্লাহর পিতা একবার রাসূলের (সা) কাছে জানালেন সকল কিছু। জানালেন পুত্র আবদুল্লাহর এমনি নির্মোহ ও নিরাসক্তির কথা।

রাসূল (সা) সবকিছু শুনে আবদুল্লাহকে ডেকে বললেন,

'আবদুল্লাহ! রোজা রাখো, ইফতার করো, নামাজ পড়, বিশ্রাম নাও এবং স্ত্রী-পরিজনের হকও আদায় করো। এটাই হলো আমার তরীকা। যে আমার তরীকা প্রত্যাখ্যান করবে সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য হবে না।'

রাসূলের (সা) নির্দেশ বলে কথা!

আবদুল্লাহ রাসূলের (সা) নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ স্বভাবে ছিলেন অত্যন্ত সাহসী।

রাসূলের (সা) যুগে যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, প্রত্যেকটিতে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন।

যুদ্ধের জন্য তার ওপর অর্পিত হতো সোয়ারী পশুর ব্যবস্থা ও জিনিসপত্র পরিবহনের দায়িত্ব।

তিনি এ দায়িত্ব অত্যন্ত যত্ন ও নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইয়ারমুকের যুদ্ধে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে হযরত ওমর ইবনুল আস তার নেতৃত্বের ঝান্ডা তুলে দেন আবদুল্লাহর হাতে। আবদুল্লাহ এই নেতৃত্বের ঝান্ডার মর্যাদা রক্ষা করেন।

এই দুঃসাহসী সৈনিক, জ্ঞানের দিক দিয়ে আবার ছিলেন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। মাতৃভাষা আরবি ছাড়াও তিনি জানতেন হিব্রু ভাষা। হিব্রু ভাষায় তিনি ছিলেন সুপন্ডিত।

জিহাদের ময়দানে সকল সময় আবদুল্লাহকে প্রথম সারিতে দেখা যেত।

আবার জিহাদ শেষ হলেই দেখা যেত আবদুল্লাহকে মসজিদের নামাজে প্রথম কাতারে।

এভাবেই আল্লাহ, রাসূল (সা) এবং ইসলামের ভালোবাসায় সারাটি জীবন অতিবাহিত করেছেন আবদুল্লাহ।

আবার জিহাদ এবং ইবাদত সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন অগ্রগামী।

মহান রাব্বুল আলামীন এমন জীবনই তো চান।

অধিক পছন্দ করেন তিনি এমন সমর্পিত বান্দাকে।

হযরত আবদুল্লাহ!

কী এক অসামান্য সফল জীবন!

যেন আলোকিত এক ঢেউয়ের মিনার!

তিনি রাসূলকে (সা) পাননি। পাননি প্রিয় নবীজীর সান্নিধ্য। কিন্তু তাতে কি! তার সেই অপূর্ণতা তিনি নিজের চেষ্টা, সাধনা, ত্যাগ আর রাসূলের (সা) প্রতি ভালবাসায় পুশিয়ে নিয়েছিলেন নবীজীর প্রিয় সাহাবীদের মাধ্যমে।

এই আলোকিত মানুষটির নাম আলকামা।

আলকামা হযরত উমর, আলী, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদসহ অনেক সাহাবীর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। তাদের জ্ঞান সমুদ্র থেকে কলস ভরে তুলে নিয়েছিলেন জীবন চলার পাথেয়। নিবারণ করেছিলেন তৃষ্ণা।

সত্যের পিপাসা তো এমনিই।

সেই পিপাসা একমাত্র জ্ঞানের সুপেয়, সুনির্মল স্বচ্ছ পানি ছাড়া আর কিছুতেই মেটে না।

আলকামার জ্ঞান তৃষ্ণা ছিল প্রচন্ড।

ছিল সত্যের প্রতি আনুগত্য এবং অনুরাগ।

আর অঢেল ভালবাসা ছিল আল্লাহর রাসূলের (সা) প্রতি।

ফলে আর শঙ্কা কিসের?

কিসের অভাব?

না, কোনো শঙ্কা নয়। বরং গভীর নিষ্ঠা আর একাগ্রতায় তিনি আল্লাহর কুরআন, রাসূলের আদর্শ এবং তাঁর হাদিসকে নিজের জীবনের একমাত্র অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করলেন। ইসলামের সার্বিক জ্ঞানে তিনি এতই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন যে তার অন্যতম শিক্ষক ইবন মাসউদ বলতে বাধ্য হন, 'আমি যত কিছু পড়েছি ও জেনেছি, তা সবই আলকামা পড়েছে ও জেনেছে।'

আলকামার ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি।

অত্যন্ত প্রখর ছিল তার ধারণ-ক্ষমতা।

কোনো কিছু একবার মুখস্থ করলে তা আর ভুলতেন না। সেটা সুমুদ্রিত গ্রন্থের মতই রয়ে যেত তার হৃদয়ে।

আলকামা এ প্রসঙ্গে নিজেই বলতেন,

'যে জিনিস আমি আমার যৌবনে মুখস্থ করেছি তা এখনও আমার হৃদয়ে এমনভাবে গেঁথে আছে, যে তা যখন পাঠ করি, তখন মনে হয় বই দেখে পড়ছি।'

মহান আল্লাহ পাক যাকে জ্ঞানভান্ডার ও মেধা দান করেন, তিনি অবশ্যই ধন্য। আল্লাহর পক্ষ থেকে এ এক বিশাল নিয়ামত।

আলকামাও আল্লাহর এই বিশেষ নিয়ামত পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি

সামান্য কিছু নয়, বরং পুরো হাদিসে হাফেজ ছিলেন। সেই সাথে আল কুরআন এবং আল ফিকাহর জ্ঞানেও ছিলেন সমান সমৃদ্ধ।

আলকামা ছিলেন একজন বড় তাবেঈ। অসাধারণ ছিল তার জ্ঞানভান্ডার। ছিলেন হাদিসে মুহাদ্দিস এবং হাফেজ।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এতবড় একজন হাদিসে হাফেজ ও মুহাদ্দিস নিজেকে কখনই বড় মনে করতেন না। এমনকি মুহাদ্দিস হিসাবে নিজেকে পরিচিত করতেও ছিলেন কুণ্ঠিত ও লজ্জিত।

একেই বলে প্রকৃত জ্ঞানী।

যে গাছে ফল যত বেশি, সেই গাছের ডালগুলি ততোই নুয়ে পড়ে। জ্ঞানীর ক্ষেত্রেও কথাটি সমান প্রযোজ্য।

কিন্তু আজকের চিত্র ভিন্ন। খালি কলস বাজে বেশি- এমনি অবস্থা।

আলকামা ছিলেন যেমন জ্ঞানী, তেমনি সত্যনিষ্ঠ ও বিনয়ী।

রাসূলের (সা) আদর্শে তিনি তার জীবনকে গড়ে তুলেছিলেন।

সাহাবীরা (রা) ছিলেন তার সামনে রাসূলের (সা) জীবন্ত প্রতিনিধি।

প্রকৃত অর্থে একজন ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির মতই তিনি সাহাবীদের (রা) কাছ থেকে আহরণ করেছেন জ্ঞান ও আত্মার খোরাক।

কী চমৎকার এক নিদর্শন!

যারা রাসূলকে (সা) দেখেনি, তারা ইবন মাসউদকে দেখেই রাসূলের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা নিতে পারতো।

আবার যারা ইবন মাসউদকে দেখেনি, তারা আলকামাকে দেখে রাসূল (সা) ও ইবন মাসউদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক বেশি অবগত হতে পারতো। এটা নিশ্চয়ই কম কথা নয়।

আলকামার এই স্বভাব চরিত্র যেমন ছিল তার হৃদয়ে, তেমনি ছিল তার চাল-চলনে ও নৈমিত্তিক যাপিত জীবনে।

আলকামা আল কুরআনকে তার প্রতিটি কাজের বাহনে রূপ দিয়েছিলেন।

ঠিক সেইভাবে রাসূলের (সা) আদর্শকেও জীবনের সকল ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতেন।

জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি আলকামা ছিলেন জিহাদের ব্যাপারেও সমান সতর্ক।

জিহাদের জন্য তিনি ছিলেন পিপাসায় কাতর।

তার ভেতরে ছিল এক সাহসের ফুলকি।

ছিল সমুদ্রের মত গর্জনমুখর।

সেই গর্জন কেবলি ফুঁসে উঠতো তার মধ্যে।

হিজরী বত্রিশ সন।

আমীর মুয়াবিয়ার সময়কাল।

সামনে কনস্টান্টিনোপল অভিযান।

কনস্টান্টিনোপল অভিযান সম্পর্কে রাসূলে করীমের (সা) একটি ভবিষ্যৎ বাণী ছিল।

এই বাহিনীতে যোগ দিলেন আলকামা।

বাহিনীর সবাই বিজয়ের অংশীদার ও সাক্ষী হওয়ার জন্য শাহাদাতের প্রবল প্রেরণায় ছিলেন উজ্জীবিত।

আর আলকামা?

তিনি তো শহীদি জীবনকে কামনা করেন সর্বক্ষণ।

শুরু হলো জিহাদের যাত্রা।

সে ছিল এক দুঃসাহসী অভিযান।

বাহিনীর সবাই প্রাণবন্ত।

একজন মুজাহিদ। নাম মুদিদ। তিনি একটি কিল্লার ওপর আক্রমণের সময় মাথায় বাঁধার জন্য চেয়ে নিলেন আলকামার চাদরটি।

মুজাহিদটি শহীদ হলেন এক পর্যায়ে।

আলকামার চাদরটিও হয়ে উঠলো শহীদের রক্তে লালে লাল!

এই রক্তে রাঙা চাদরটিকে আলকামা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে কাঁধে ঝুলিয়ে রাখতেন।

যেতেন জুমআর নামাজেও।

বলতেন, 'আমি এই চাদরটি আমার কাঁধে এজন্য ঝুলিয়ে রাখি যে, এতে একজন শহীদের খুনের স্পর্শ আছে।'

আহ! কী মমতাভরা উচ্চারণ তার!

এত বড় একজন জ্ঞানী তাবেঈ। কত তার মর্যাদা!

অথচ তিনি খ্যাতি ও প্রচারকে খুব ভয় করতেন।

প্রচার ও খ্যাতি থেকে তিনি সর্বদা নিজেকে দূরে রাখতেন। গুটিয়ে রাখতেন নিজেকে। মনে-প্রাণে তিনি এটাকে ঘৃণা করতেন। এজন্য এড়িয়ে চলতেন সম্ভাব্য খ্যাতি ও প্রচারণার পথগুলো।

হযরত আলকামা!

কী অসাধারণ ছিল তার শিক্ষা ও জ্ঞানের বহর!

কী অসাধারণ ছিল তার মানসিক ও নৈতিক শক্তি।

সন্দেহ নেই, এমন ব্যক্তিই তো আল্লাহর পছন্দ। পছন্দ রাসূলেরও (সা)।

প্রকৃত অর্থে, আল্লাহ এবং রাসূলকে (সা) ভালবেসে সাহসের পর্বতে সুদৃঢ়ভাবে অবিচল থাকতে পারলেই কেবল অর্জন করা যায় হযরত আলকামার (রহ) মত সফল জীবন।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)।

জন্মগ্রহণ করেন মরুভূমির দেশ–আরবের মক্কা নগরে।

সময়টি ছিল ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২০শে এপ্রিল, ১২ই রবিউল আউয়াল।

'রাসূলের (সা) আগমন সম্পর্কে আল্লাহ পাক আল কুরআনে বলেন,

'সৃষ্টি জগতের রহমতস্বরূপ তোমাকে রাসূল করে পাঠিয়েছি।'

সূরা আল আযহাবে আরও বলা হয়েছে ঃ

'হে নবী! তোমাকে সাক্ষ্যদানকারী, সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী এবং আল্লাহর নির্দেশ তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও একটি উজ্জ্বল প্রদীপ বানিয়ে পাঠিয়েছি।'

সত্যিই প্রদীপসম ছিলেন দয়ার নবীজী (সা)।

তাঁর আলোকে চারপাশ আলোকিত হয়ে উঠেছিল। তখন চারদিক কেমন সব ফকফকা, উজ্জ্বল।

মুহাম্মাদ (সা) এর বংশের নাম কুরাইশ। গোত্রের নাম বনি হাশিম। পরিবার মুত্তালিব। আব্বার নাম- আবদুল্লাহ। আম্মার নাম- আমিনা। দাদার নাম- আবদুল মুত্তালিব। আর নানার নাম- ওয়াহাব।

আবদুল মুত্তালিবের পরিবারটি ছিল কুরাইশদের মধ্যে অত্যন্ত খান্দানী ও শরীফ। তার সুনাম ও সুখ্যাতি ছিল প্রচুর।

নবীজীর চাচা ছিলেন যথাক্রমে হারিস, আবুল ওজ্জা (আবু লাহাব), আবু তালিব, দিরার, আব্বাস, মুকাওবীম, জ্বহল, হামযা ও জুবায়ের।

আর তাঁর ফুফু ছিলেন 'আতিকাহ, ওমায়মা, আরওয়া, বাররা, উম্মে হাকীম ও সফিয়্যাহ।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) দুধমাতা ছিলেন কানিজ ছওবিয়া ও হালিমা ছা'দিয়া।

দয়ার নবীজীর শৈশবকালটি ছিল একেবারেই অন্যরকম।

তাঁর জন্মের আগেই ইন্তেকাল করলেন আব্বা। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত দুধ-মা হালিমার কাছে প্রতিপালিত হন। পরবর্তী ছয় মাস আম্মার কাছে। ছয় বছর বয়সে ইন্তেকাল করলেন আম্মা। পরবর্তী দুই বছর দাদার কাছে প্রতিপালিত হন।

আট বছর বয়সে দাদা ইন্তেকাল করলেন।

দাদার ইন্তেকালের পর চাচা আবু তালিবের কাছে প্রতিপালিত হন রাসূল মুহাম্মাদ (সা)।

বার বছর বয়সে দয়ার নবীজী (সা) চাচা আবু তালিবের সাথে সিরিয়া গমন করেন।

মাত্র সতের বছর বয়সে দুঃসাহসী যুবক নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) কয়েকজন যুবকের মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে তুললেন মজলুম মানবতার মুক্তিকামী প্রথম সংগঠন 'হিলফুল ফুজুল।'

'হিলফুল ফুজুল' সংগঠনের শপথ ছিল পাঁচটি। যেমন ঃ

১. নিঃস্ব, অসহায়, দুর্গতদের সেবা করবো।

২. অত্যাচারীকে প্রাণপণে বাধা দেব।

৩. মজলুমকে সাহায্য করবো।

৪. দেশের শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করবো।

৫. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করবো।

প্রকৃত অর্থে, আজকের দিনের জন্যও এই পাঁচটি শপথ আমাদের সকলের জন্য সমান জরুরি।

মুহাম্মাদ (সা) সেই যৌবন বয়সেই 'নূর' পাহাড়ের হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এই হেরা গুহায় ধ্যানরত অবস্থায় একদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হলো :

'ইকরা বিইসমি রাব্বিকাল্‌লাজি খালাক।'

'পড় তোমার রবের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।'

আয়াতটি শোনার সাথে সাথেই অভিভূত হয়ে গেলেন দয়ার নবীজী। তিনি বাড়ি এসে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। তখনও তিনি সমানে কম্পমান।

ঠিক এই সময় আবার নাজিল হলো ঃ

'হে কম্বল আচ্ছাদিত ব্যক্তি!

ওঠো, লোকদেরকে সাবধান করো এবং তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করো।'

এরপর রাসূল (সা) ছাফা পাহাড়ে উঠে মক্কাবাসীদের ডাকলেন,

'ইয়া সাবাহা...........'

রাসূলের (সা) সেই সংকেত শুনে ছুটে এলো মক্কাবাসী।

তাদেরকে লক্ষ্য করে রাসূল (সা) বললেন :

"হে ধ্বংস পথের যাত্রীদল! হুঁশিয়ার হও। এখনো সময় আছে, এখনো পথ আছে। এক আল্লাহর ইবাদত করো। অন্তরকে সুন্দর করো। তাহলেই দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের কল্যাণ হবে।"

রাসূলের (সা) প্রথম ডাকেই সাড়া দিয়ে ঈমান আনলেন মাত্র আটজন। তাঁরা হলেন- প্রথম মহিলা রাসূলের (সা) স্ত্রী খাদিজাতুল কুবরা, প্রথম কিশোর- আলী (রা), প্রথম ক্রীতদাস- জায়েদ (রা), আবুবকর সিদ্দিক (রা), উম্মে আয়মান, আমার বিন আম্বাছা (রা), বেলাল (রা) ও খালিদ বিন সা'দ (রা)।

নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত খাদিজাতুল কুবরা।

এরপর একে একে আরও কিছু মহিলা ইসলাম কবুল করলেন। যেমন

আববাসের স্ত্রী উম্মুল ফাজল (রা), আনিসের কন্যা আসমা (রা), আবুবকরের কন্যা আসমা (রা) ও উমরের বোন ফাতিমা (রা)।

খাদিজা (রা) যেমন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী, তেমনি মহিলাদের মধ্যে প্রথম শহীদ হযরত সুমাইয়া (রা)। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় শহীদ হিসাবে ইতিহাসের পাতায়ও অমর হয়ে আছেন।

হযরত ফাতেমার (রা) অক্লান্ত ও নির্ভীক প্রচেষ্টায় ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁর ভাই উমর। এই দুঃসাহসী উমরই (রা) ছিলেন রাসূলের (সা) ওফাতের পর আমাদের দ্বিতীয় খলীফা।

সময় এলো আবিসিনিয়ায় হিজরাতের। এটাই প্রথম হিজরাত। এই প্রথম হিজরাতে প্রথম দলের সাথে ছিলেন বেশ কয়েকজন মহিলা। তাঁরা হলেন- রোকাইয়া (রা), সালমা বিনতে সুহাইল (রা), উম্মে সালমা বিনতে আবি উমাইয়া (রা), লায়লা বিনতে আবি হাশমাহ (রা)।

রাসূলের (সা) আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন সেই সময়ের চিন্তাশীল সত্যানুরাগী মানুষ, বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত মানুষ, এবং লাঞ্ছিতা বেশ কিছু নারী।

নবীজীর (সা) কণ্ঠ যত বুলন্দ হলো, ইসলামের আহ্বান যত জোরদার হলো- ততোই সত্যের সাহসী মানুষের ওপর পাপীষ্ঠদের অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেল।

ইসলামের বুলন্দ আওয়াজকে মিটিয়ে দেবার জন্য কাফের-মুশরিকরা শুরু করলো সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র ও হামলা।

তাদের নির্যাতন ও অত্যাচারে প্রথম দিকেই একে একে শহীদ হলেন- হারেস ইবনে আবিহালা (রা), সুমাইয়া (রা), ইয়াসির (রা) ও খোবায়েব

(রা)। আর চরমভাবে নির্যাতিত হলেন- আম্মার (রা), খাববাব (রা), যুবায়ের (রা), বিলাল (রা), সোহাইব (রা), আবু ফকীহা (রা), লুবাইনা (রা), যুনাইয়া (রা) ও নাহদিয়া (রা)।

নবুওয়তের ৬ষ্ঠ বছর।

এই সময়েই ঘটে গেল এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

ছাফা থেকে মুসলমানদের একটি মিছিল বের হয় রাসূলের (সা) নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরে।

মিছিলের দুই সারির সামনে ছিলেন হামযা (রা) ও উমর ফারুক (রা)।

উভয়ের মাঝে ছিলেন মহান সেনাপতি– রাসূল (সা)।

সবার কণ্ঠে ছিল 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি। এই ঐতিহাসিক প্রথম মিছিলটি শেষ হয় কাবায় গিয়ে।

নবুওয়াতের ৭ম বছরে মুসলমানরা সামাজিক বয়কটের শিকার হন।

মক্কার সকল গোত্র বনি হাশিম গোত্রের সাথে আত্মীয়তা, কেনা-বেচা, খাদ্য বিনিময়সহ সকল প্রকার লেনদেন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

মুসলমানরা 'শিআবে আবি তালিব' নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এই সময় তাঁরা ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও কষ্টের মধ্যে দিয়ে এক চরমতম পরীক্ষার সম্মুখীন হন। মুসলমানদের ওপরে এই দুঃসহ অবরোধ চলে টানা তিনটি বছর।

তবুও হতোদ্যম হননি রাসূল (সা)।

ভেঙ্গে পড়েননি একজন মুসলমানও।

এই কঠিনতম পরীক্ষায় পাস করলেন রাসূল (সা)সহ সত্যের সাহসী সৈনিকরা।

নবী (সা) এবার মক্কা থেকে ষাট মাইল দূরে, তায়েফে গেলেন দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে। সেখানে তিনি ক্রমাগত দশদিন দাওয়াতী অভিযান চালালেন।

কিন্তু তায়েফবাসীরা রাসূলের (সা) দাওয়াত গ্রহণ করলো না।

বরং তাদের হাতে চরমভাবে লাঞ্ছিত ও রক্তাক্ত হলেন দয়ার নবীজী (সা)।

তবুও থেমে থাকলো না রাসূলের (সা) দ্বীনের দাওয়াতী অভিযান।

দাওয়াতের ব্যাপারে রাসূলের (সা) ক্রমাগত চেষ্টা ও দুঃসাহসিক অভিযাত্রার ফলেই তো এক সময় সেই তায়েফের মানুষই ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

নবুওয়তের দশম বছর।

এই সময় মানবতার মুক্তির দিশারী নবী মুহাম্মাদ (সা) মিরাজে গমন করেন।

মিরাজের শিক্ষার ভেতরেই ছিল ইসলামী সমাজ গঠনের একটি প্রাথমিক সুনিপুণ চিত্র। মিরাজ থেকে চৌদ্দটি বুনিয়াদী শিক্ষার সাথে রাসূল (সা) আমাদেরকে পরিচিত করিয়ে দিলেন। এগুলি হলো ঃ

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করো না।

২. আব্বা-আম্মার প্রতি সুন্দর ব্যবহার করো।

৩. অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় এবং মুসাফিরদের হক আদায় করো।

৪. সম্পদের অপচয় করো না।

৫. মিতব্যয়ী হও।

৬. রিজিকের হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন।

৭. অভাবের আশঙ্কায় সন্তান হত্যা করো না।

৮. ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না।

৯. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না।

১০. এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করো না।

১১. ওয়াদা ও চুক্তিনামা ভঙ্গ করো না।

১২. সঠিকভাবে মাপ ও ওজন করো।

১৩. আন্দাজ-অনুমানের বশবর্তী হয়ো না।

১৪. অহমিকা বর্জন করো।

আল্লাহর মনোনীত ও পছন্দনীয় ইসলামী সমাজ গঠনের জন্য মক্কার পরিবেশ দিনদিনই প্রতিকূলে চলে যেতে লাগলো।

অন্যদিকে মদিনা ছিল ইসলামের জন্য একটি উর্বর ভূমি।

রাসূল (সা) আল্লাহর নির্দেশে সিদ্ধান্ত নিলেন মদিনায় হিজরাতের।

হযরত আবুবকরকে (রা) সাথে নিয়ে বহু চড়াই-উৎরাই ও বন্ধুর পথ পেরিয়ে তিনি পৌঁছুলেন মদিনায়।

রাসূলের (সা) এই হিজরতের সময় থেকেই 'হিজরী' সাল গণনা শুরু হয়।

৮ই রবিউল আউয়াল।

মদিনা থেকে তিন মাইল দক্ষিণে কুবা পল্লীতে রাসূল (সা) উপস্থিত হলেন। এই কুবা পল্লীতে রাসূল ছিলেন চৌদ্দ দিন।

এখানেই তিনি স্থাপন করেন মসজিদে কুবা। কুবাই হলো মুসলমানদের প্রথম মসজিদ। এই কুবা মসজিদেই প্রথম সালাতুল জুমআ অনুষ্ঠিত হয়।

কুবা পল্লীতে চৌদ্দ দিন অবস্থানের পর রাসূল (সা) আবার যাত্রা শুরু করলেন মদিনার দিকে।

রাসূল (সা) মদিনায় যাচ্ছেন।

পেছনে রয়েছে পড়ে তাঁর প্রিয়তম জন্মভূমি মক্কা।

মক্কা!

মক্কা রাসূলের (সা) জন্মভূমি।

কিন্তু সেই মক্কার দুর্ভাগা মানুষ তার এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তানকে চিনতে পারলো না।

তাঁকে কষ্ট দিল নিদারুণ।

মক্কা!

প্রিয় জন্মভূমি মক্কা!

একদিনের জন্যও যেখানে রাসূল (সা) টিকতে পারেননি শান্তিতে।

প্রতি পদে পদে যেখানে তিনি পেয়েছেন কষ্ট আর লাঞ্ছনা।

তবুও সেই মক্কার জন্য প্রাণটা কাঁদছে রাসূলের (সা)।

তিনি বারবার পেছনে ফিরে তাকাচ্ছেন। আর দেখে নিচ্ছেন ধূসর-ধুসরতম তাঁর প্রিয় জন্মভূমিটি।

সামনেই মদিনা।

মদিনার পরিবেশ মক্কার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে বয়ে যাচ্ছে কোমল বাতাস।

শিরশির হাওয়া।

রাসূল (সা) আসছেন!

আসছেন আলোকের সভাপতি!

মুহূর্তেই সুসংবাদটি ছড়িয়ে গেল মদিনার ঘরে ঘরে।

মদিনার উপকণ্ঠে মানুষের ভীড়।

হৃদয়ে তাদের তৃষ্ণার মরুভূমি।

কখন আসবেন রাসূল (সা)?

কখন?

প্রতীক্ষার পালা শেষ।

এক সময় মদিনায় পৌঁছুলেন রাসূল (সা)।

রাসূলের (সা) জন্য মদিনাবাসীরা আয়োজন করলো সম্বর্ধনার।

সে কি মনোরম দৃশ্য!

সে কি অভাবনীয় ব্যাপার!

রাসূল (সা) আসছেন!

তাঁর আগমনে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে শিশু-কিশোরদের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো ঃ

"তালাআল বাদরু আলাইনা

মিন সানিয়াতিল বিদাঈ

ওয়াজাবাশ শুকরু আলাইনা

মাদাআ লিল্লাহি দাঈ।"

রাসূল (সা) এসেছেন মদিনায়!

মদিনার ঘরে ঘরে বয়ে যাচ্ছে আজ খুশির ঢল।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষটিকে পেয়ে তারা আনন্দে বাগবাগ।

রাসূল (সা) এসেছেন!

রাসূল (সা) এসেছেন মদিনায়।

মুহূর্তেই মদিনার আকাশ-বাতাস মথিত করে ছুটে চললো আনন্দের অপার্থিব, জ্যোতিষ্কমান এক ঘূর্ণি।

হযরত মুহাম্মদ (সা)।

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। সর্বশ্রেষ্ঠ নবী।

নূরে 'আলা নূর।

বস্তুত রাসূল (সা) আমার আলোর জ্যোতি।